KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৩নং হেস্টিংস্ স্ট্রীট, কলকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher : প্রমথ চৌধুরী
Title : সবুজ পত্র (SABUJ PATRA)	Size : 7.5"x6"
Vol. & Number : 4/6-7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12	Year of Publication : আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৪ অগ্রহায়ণ ১৩২৪ পৌষ ১৩২৪ ফাল্গুন ১৩২৪ ফাল্গুন ১৩২৪ চৈত্র ১৩২৪
	Condition : Brittle / Good
Editor : প্রমথ চৌধুরী	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র * কলিকাতা-৭০০ ০০৯

ছন্দ।

শুধু কথা যখন খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে তখন কেবলমাত্র অর্থকে প্রকাশ করে। কিন্তু সেই কথাকে যখন বিশেষ গতি দেওয়া যায় তখন সে আপন অর্থের চেয়ে আরও কিছু বেশি প্রকাশ করে। সেই বেশিটুকু যে কি তা বলাই শক্ত। কেননা তা কথার অতীত, সুতরাং অনির্ব্বচনীয়। যা আমরা দেখচি শুনচি জান্‌চি তার সঙ্গে যখন অনির্ব্বচনীয়ের যোগ হয় তখন তাকেই আমরা বলি রস—অর্থাৎ সে-জিনিসটাকে অনুভব করা যায়, ব্যাখ্যা করা যায় না। সকলে জানেন এই রসই হচ্চে কাব্যের বিষয়।

এইখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার—অনির্ব্বচনীয় শব্দটার মানে অভাবনীয় নয়। তা যদি হত তাহলে ওটা কাব্যে অকাব্যে কুকাব্যে কোথাও কোনো কাজে লাগত না। বস্তু পদার্থের সংজ্ঞা নির্ণয় করা যায় কিন্তু রস পদার্থের করা যায় না। অথচ রস আমাদের একান্ত অনুভূতির বিষয়। গোলাপকে আমরা বস্তুরূপে জানি, আর গোলাপকে আমরা রসরূপে পাই। এর মধ্যে বস্তু-জানাকে আমরা সাদা কথায় তার আকার আয়তন ভার কোমলতা প্রভৃতি বহুবিধ পরিচয়ের দ্বারা ব্যাখ্যা করতে পারি কিন্তু রস-পাওয়া এমন একটি অখণ্ড ব্যাপার যে তাকে তেমন করে সাদা কথায় বর্ণনা করা যায় না—কিন্তু তাই বলেই সেটা অলৌকিক অদ্ভুত অসামান্য কিছুই নয়। বরঞ্চ রসের অনুভূতি বস্তু-জ্ঞানের চেয়ে আরো প্রবলতর গভীরতর। এই জন্য গোলাপের আনন্দকে আমরা

যখন অন্যের মনে সঞ্চার করতে চাই তখন সে একটা সাধারণ অভিজ্ঞতার রাস্তা দিয়েই করে থাকে। তফাৎ এই, বস্তু-অভিজ্ঞতার ভাষা সাদা কথার বিশেষণ, কিন্তু রস-অভিজ্ঞতার ভাষা আকার ইঙ্গিত সুর এবং রূপক। পুরুষের যে-পরিচয় হচ্চে তিনি আপিসের বড় বাবু সেটা আপিসের খাতা পত্র দেখ্‌লেই জানা যায়, কিন্তু মেয়ের যে-পরিচয় তিনি গৃহলক্ষ্মী সেটা প্রকাশের জন্যে তাঁর সিঁথেয় সিঁদুর, তাঁর হাতে কঙ্কণ। অর্থাৎ এটার মধ্যে রূপক চাই, অলঙ্কার চাই, কেননা কেবল মাত্র তথ্যের চেয়ে এ যে বেশি—এর পরিচয় শুধু জ্ঞানে নয় হৃদয়ে। ঐ যে গৃহলক্ষ্মীকে লক্ষ্মী বলা গেল এইটেই ত হল একটা কথার ইসারা মাত্র—অথচ আপিসের বড় বাবুকে ত আমাদের কেরাণী-নারায়ণ বলবার ইচ্ছাও হয় না, যদিও ধর্ম্মতত্ত্বে বলে থাকে সকল নরের মধ্যেই নারায়ণের আবির্ভাব আছে। তাহলেই বোঝা যাচ্চে আপিসের বড় বাবুর মধ্যে অনির্ব্বচনীয়তা নেই—কিন্তু যেখানে তাঁর গৃহিণী সাধ্বী সেখানে তাঁর মধ্যে আছে। তাই বলে এমন কথা বলা যায় না, যে ঐ বাবুটিকেই আমরা সম্পূর্ণ বুঝি আর মা'লক্ষ্মীকে বুঝি নে—বরঞ্চ উল্টো। কেবল কথা এই, যে, বোঝবার বেলায় মা'লক্ষ্মী যত সহজ বোঝাবার বেলায় তত নয়।

"কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।" ব্যাপারটা ঘটনা হিসাবে সহজ। কোনো এক ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে তৃতীয় ব্যক্তির নাম উচ্চারণ করেচে। এমন কাণ্ড দিনের মধ্যে পঞ্চাশবার ঘটে। এটুকু বলবার জন্যে কথাকে বেশি নাড়া দেবার দরকার হয় না। কিন্তু নাম কানের ভিতর দিয়ে যখন মরমে গিয়ে পশে—অর্থাৎ এমন জায়গায় কাজ করতে থাকে যে-জায়গা দেখা শোনার অতীত, এবং এমন কাজ করতে থাকে

যাকে মাপা যায় না, ওজন করা যায় না, চোখের সাম্‌নে দাঁড় করিয়ে যার সাক্ষ্য নেওয়া যায় না, তখন কথাগুলোকে নাড়া দিয়ে তাদের পুরো অর্থের চেয়ে তাদের কাছ থেকে আরো অনেক বেশি আদায় করে নিতে হয়। অর্থাৎ আবেগকে প্রকাশ করতে গেলে কথার মধ্যে সেই আবেগের ধর্ম্ম সঞ্চার করতে হয়। আবেগের ধর্ম্ম হচ্চে বেগ। কথা যখন সেই বেগ গ্রহণ করে তখনই আমাদের হৃদয়-ভাবের সঙ্গে তার মিল ঘটে।

এই বেগের কত বৈচিত্র্যই যে আছে তার ঠিকানা নেই। এই বেগের বৈচিত্র্যেই ত আলোকের রং বদল হচ্চে, শব্দের সুর বদল হচ্চে, এবং লীলাময়ী সৃষ্টি রূপ থেকে রূপান্তর গ্রহণ করচে। এমন কি সৃষ্টির বাইরের পর্দ্দা সরিয়ে ভিতরের রহস্য-নিকেতনে যতই প্রবেশ করা যায় ততই বস্তু ঘুচে গিয়ে কেবল বেগই প্রকাশ পেতে থাকে। শেষকালে এই কথাই মনে হয় প্রকাশ-বৈচিত্র্যের মূলে বুঝি এই বেগ-বৈচিত্র্য। যদিদং সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং।

মানুষের সত্তার মধ্যে এই অনুভূতিলোকই হচ্চে সেই রহস্যলোক যেখানে বাহিরের রূপজগতের সমস্ত বেগ অন্তরে আবেগ হয়ে উঠ্‌চে, এবং সেই অন্তরের আবেগ আবার বাহিরে রূপ গ্রহণ করবার জন্যে উৎসুক হচ্চে। এই জন্যে বাক্য যখন আমাদের অনুভূতিলোকের বাহনের কাজে ভর্ত্তি হয় তখন তার গতি না হলে চলে না। সে তার অর্থের দ্বারা বাহিরের ঘটনাকে ব্যক্ত করে, গতির দ্বারা অন্তরের গতিকে প্রকাশ করে।

শ্যামের নাম রাধা শুনেচে। ঘটনাটা শেষ হয়ে গেচে। কিন্তু যে-একটা অদৃশ্য বেগ জম্‌ল তার আর শেষ নেই। আসল ব্যাপারটাই

হল তাই। সেই জন্যে কবি ছন্দের ঝঙ্কারের মধ্যে এই কথাটাকে দুলিয়ে দিলেন। যতক্ষণ ছন্দ থাকবে ততক্ষণ এই দোলা আর থামবে না। "সই, কেবা শুনাইলে শ্যাম নাম।" কেবলি ঢেউ উঠ্‌তে লাগ্‌ল। ঐ কটি কথা ছাপার অক্ষরে যদিও ভাল মানুষের মত দাঁড়িয়ে থাকার ভান করে কিন্তু ওদের অন্তরের স্পন্দন আর কোনো দিনই শান্ত হবে না। ওরা অস্থির হয়েচে, এবং অস্থির করাই ওদের কাজ।

আমাদের পুরাণে ছন্দের উৎপত্তির কথা যা বলেচে তা সবাই জানেন। দুটি পাখীর মধ্যে একটিকে যখন ব্যাধ মারলে তখন বাল্মীকি মনে যে-ব্যথা পেলেন সেই ব্যথা শ্লোক দিয়ে না জানিয়ে তাঁর উপায় ছিল না। যে-পাখীটা মারা গেল এবং আর যে-একটি পাখী তার জন্যে কাঁদল তারা কোন্‌কালে লুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু এই নিদারুণ-তার ব্যথাটিকে ত কেবল কালের মাপকাঠি দিয়ে মাপা যায় না। সে যে অনন্তের বুকে বেজে রইল। সেই জন্যে কবির শাপ ছন্দের বাহনকে নিয়ে কাল থেকে কালান্তরে ছুটতে চাইলে। হায়রে, আজও সেই ব্যাধ নানা অস্ত্র হাতে নানা বীভৎসতার মধ্যে নানা দেশে নানা আকারে ঘুরে বেড়াচ্চে। কিন্তু সেই আদিকবির শাপ শাশ্বত-কালের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে রইল। এই শাশ্বত-কালের কথাকে প্রকাশ করবার জন্যেই ত ছন্দ।

আমরা ভাষায় বলে থাকি, কথাকে ছন্দে বাঁধা। কিন্তু এ কেবল বাইরে বাঁধন, অন্তরে মুক্তি। কথাকে তার জড়ধর্ম্ম থেকে মুক্তি দেবার জন্যেই ছন্দ। সেতারের তার বাঁধা থাকে বটে কিন্তু তার থেকে সুর পায় ছাড়া। ছন্দ হচ্চে সেই তার-বাঁধা সেতার, কথার অন্তরের সুরকে সে ছাড়া দিতে থাকে। ধনুকের সে ছিলা, কথাকে সে তীরের মত লক্ষ্যের মর্ম্মের মধ্যে প্রক্ষেপ করে।

গোড়াতেই ছন্দ সম্বন্ধে এতখানি ওকালতি করা হয় ত বাহুল্য বলে অনেকের মনে হতে পারে। কিন্তু আমি জানি এমন লোক আছেন যাঁরা ছন্দকে সাহিত্যের একটা কৃত্রিম প্রথা বলে মনে করেন। তাই আমাকে এই গোড়ার কথাটা বুঝিয়ে বল্‌তে হল যে, পৃথিবী ঠিক চব্বিশ ঘণ্টার ঘূর্ণিলয়ে তিনশো পঁয়ষট্টি মাত্রার ছন্দে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, সেও যেমন কৃত্রিম নয়, ভাবাবেগ তেমনি ছন্দকে আশ্রয় করে' আপন গতিকে প্রকাশ করবার যে চেষ্টা করে সেও তেমনি কৃত্রিম নয়।

এইখানে কাব্যের সঙ্গে গানের তুলনা করে আলোচ্য বিষয়টাকে পরিষ্কার করবার চেষ্টা করা যাক্।

সুর পদার্থটাই একটা বেগ। সে আপনার মধ্যে আপনি স্পন্দিত হচ্চে। কথা যেমন অর্থের মোক্তারি করবার জন্যে, সুর তেমন নয়—সে আপনাকেই আপনি প্রকাশ করে। বিশেষ সুরের সঙ্গে বিশেষ সুরের সংযোগে ধ্বনি-বেগের একটা সমবায় উৎপন্ন হয়। তাল সেই সমবেত বেগটাকে গতিদান করে। ধ্বনির এই গতি-বেগে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যে গতি সঞ্চার করে সে একটা বিশুদ্ধ আবেগ মাত্র—তার যেন কোনো অবলম্বন নেই। সাধারণত সংসারে আমরা কতকগুলি বিশেষ ঘটনা আশ্রয় করে সুখে দুঃখে বিচলিত হই। সেই ঘটনা সত্যও হতে পারে, কাল্পনিকও হতে পারে অর্থাৎ আমাদের কাছে সত্যের মত প্রতিভাত হতে পারে। তারই আঘাতে আমাদের চেতনা নানা রকমে নাড়া পায়—সেই নাড়ার প্রকার-ভেদে আমাদের আবেগের প্রকৃতি-ভেদ ঘটে। কিন্তু গানের সুরে আমাদের চেতনাকে যে-নাড়া দেয় সে কোনো ঘটনার উপলক্ষ্য দিয়ে নয়, সে একেবারে অব্যবহিত-

ভাবে। সুতরাং তাতে যে আবেগ উৎপন্ন হয় সে অহৈতুক আবেগ। তাতে আমাদের চিত্ত নিজের স্পন্দন-বেগেই নিজেকে জানে—বাইরের সঙ্গে কোনো ব্যবহারের যোগে নয়।

সংসারে আমাদের জীবনে যে সব ঘটনা ঘটে তার সঙ্গে নানা দায় জড়ানো আছে। জৈবিক দায়, বৈষয়িক দায়, সামাজিক দায়, নৈতিক দায়। তার জন্যে নানা চিন্তায় নানা কাজে আমাদের চিত্তকে বাইরে বিক্ষিপ্ত করতে হয়। শিল্পকলায়, কাব্যে এবং রস-সাহিত্য মাত্রেই আমাদের চিত্তকে সেই সমস্ত দায় থেকে মুক্তি দেয়। তখন আমাদের চিত্ত সুখ দুঃখের মধ্যে আপনারই বিশুদ্ধ প্রকাশ দেখতে পায়। সেই প্রকাশই আনন্দ। এই প্রকাশকে আমরা চিরন্তন বলি এই জন্যে, যে, বাইরের ঘটনাগুলি সংসারের জাল বুনতে বুনতে নানা প্রয়োজন সাধন করতে করতে সরে যায় চলে যায়, তাদের নিজের মধ্যে নিজের কোনো চরম মূল্য নেই। কিন্তু আমাদের চিত্তের যে আত্মপ্রকাশ তার আপনাতেই আপনার চরম—তার মূল্য তার আপনার মধ্যেই পর্য্যাপ্ত। তমসাতীরে ক্রৌঞ্চ-বিরহিণীর দুঃখ কোন খানেই নেই কিন্তু আমাদের চিত্তের আত্মানুভূতির মধ্যে সেই বেদনার তার বাঁধা হয়েই আছে—সে ঘটনা এখন ঘটচে না, বা সে ঘটনা কোনো কালেই ঘটে নি এ কথা তার কাছে প্রমাণ করে কোনো লাভ নেই।

যাহোক্, দেখা যাচ্ছে, গানের স্পন্দন আমাদের চিত্তের মধ্যে যে-আবেগ জন্মিয়ে দেয়, সে কোনো সাংসারিক ঘটনামূলক আবেগ নয়। তাই মনে হয় সৃষ্টির গভীরতার মধ্যে যে-একটি বিশ্বব্যাপী প্রাণকম্পন চলচে গান শুনে সেইটেরই বেদনাবেগ যেন আমরা চিত্তের মধ্যে অনুভব করি। ভৈরবী যেন সমস্ত সৃষ্টির অন্তরতম বিরহব্যাকুলতা,

দেশমল্লার যেন অশ্রুগঙ্গোত্রীর কোন্ আদি নির্ঝরের কলকল্লোল। এতে করে আমাদের চেতনা দেশকালের সীমা পার হয়ে নিজের চঞ্চল প্রাণধারাকে বিরাটের মধ্যে উপলব্ধি করে।

কাব্যেও আমরা আমাদের চিত্তের এই আত্মানুভূতিকে বিশুদ্ধ এবং মুক্তভাবে অথচ বিচিত্র আকারে পেতে চাই। কিন্তু কাব্যের প্রধান উপকরণ হল কথা। সেত সুরের মত স্বপ্রকাশ নয়। কথা অর্থকে জানাচ্চে। অতএব কাব্যে এই অর্থকে নিয়ে কারবার করতেই হবে। তাই গোড়ায় দরকার এই অর্থটা যেন রসমূলক হয়। অর্থাৎ সেটা এমন কিছু হয় যা স্বতই আমাদের মনে স্পন্দন সঞ্চার করে, যাকে আমরা বলি আবেগ।

কিন্তু যে হেতু কথা জিনিসটা স্বপ্রকাশ নয় এই জন্যে সুরের মত কথার সঙ্গে আমাদের চিত্তের সাধর্ম্ম্য নেই। আমাদের চিত্ত বেগবান, কিন্তু কথা স্থির। এ প্রবন্ধের আরম্ভেই আমরা এই বিষয়টার আলোচনা করেচি। বলেচি, কথাকে বেগ দিয়ে আমাদের চিত্তের সামগ্রী করে তোলবার জন্যে ছন্দের দরকার। এই ছন্দের বাহনযোগে কথা কেবল যে দ্রুত আমাদের চিত্তে প্রবেশ করে তা নয়, তার স্পন্দনে নিজের স্পন্দন যোগ করে দেয়।

এই স্পন্দনের যোগে শব্দের অর্থ যে কি অপরূপতা লাভ করে তা আগে থাকতে হিসাব করে বলা যায় না। সেই জন্যে কাব্যরচনা একটা বিস্ময়ের ব্যাপার। তার বিষয়টা কবির মনে বাঁধা, কিন্তু কাব্যের লক্ষ্য হচ্চে বিষয়কে অতিক্রম করা; সেই বিষয়ের চেয়ে বেশিটুকুই হচ্চে অনির্ব্বচনীয়। ছন্দের গতি কথার মধ্যথেকে সেই অনির্ব্বচনীয়কে জাগিয়ে তোলে।

"রজনী সাঙন ঘন, ঘন দেয়া-গরজন,
রিমিঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে।"

বাদলার রাত্রে একটি মেয়ে বিছানায় শুয়ে ঘুমচ্চে বিষয়টা এইমাত্র, কিন্তু ছন্দ এই বিষয়টিকে আমাদের মনে কাঁপিয়ে তুল্‌তেই এই মেয়ের ঘুমোনো ব্যাপারটি যেন নিত্যকালকে আশ্রয় করে একটি পরম ব্যাপার হয়ে উঠল—এমন কি, জর্ম্মন কাইজার আজ যে চার বছর ধরে এমন দুর্দ্দান্ত প্রতাপে লড়াই করচে সেও এর তুলনায় তুচ্ছ এবং অনিত্য। ঐ লড়াইয়ের তথ্যটাকে এক দিন বহুকষ্টে ইতিহাসের বই থেকে মুখস্থ করে ছেলেদের একজামিন পাস করতে হবে—কিন্তু পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে নিন্দ যাই মনের হরিষে—এ পড়া-মুখস্থ করার জিনিস নয়। এ আমরা আপনার প্রাণের মধ্যে দেখতে পাব, এবং যা দেখব সেটা একটি মেয়ের বিছানায় শুয়ে ঘুমোনোর চেয়ে অনেক বেশি। এই কথাটাকেই আরেক ছন্দে লিখলে বিষয়টা ঠিকই থাক্‌বে কিন্তু বিষয়ের চেয়ে বেশি যেটা, তার অনেকখানি বদল হবে।

শ্রাবণ মেঘে তিমির-ঘন শর্ব্বরী,
বরিষে জল কাননতল মর্ম্মরি' ॥
জলদরব-ঝঙ্কারিত ঝঞ্ঝাতে
বিজন ঘরে ছিলাম সুখ-তন্দ্রাতে,
অলস মম শিথিল তনু-বল্লরী।
মুখর শিখী শিখরে ফিরে সঞ্চরি ॥

এই ছন্দে হয়ত বাইরের ঝড়ের দোলা কিছু আছে কিন্তু মেয়েটির ভিতরের গভীর কথা ফুট্‌ল না। এ আর-এক জিনিস হল।

ছন্দ কবিতার বিষয়টির চারদিকে আবর্ত্তন করচে। পাতা যেমন গাছের ডাঁটার চারদিকে ঘুরে ঘুরে তাল রেখে ওঠে এও সেই রকম। গাছের বস্তু-পদার্থ তার ডালের মধ্যে গুঁড়ির মধ্যে মজ্জাগত হয়ে রয়েচে, কিন্তু তার লাবণ্য, তার চাঞ্চল্য, বাতাসের সঙ্গে তার আলাপ, আকাশের সঙ্গে তার চাউনির বদল এসমস্ত প্রধানত তার পাতার ছন্দে।

পৃথিবীর আহ্নিক এবং বার্ষিক গতির মত কাব্যে ছন্দের আবর্ত্তনের দুটি অঙ্গ আছে, একটি বড় গতি আর একটি ছোট গতি। অর্থাৎ চাল এবং চলন। প্রদক্ষিণ এবং পদক্ষেপ। দৃষ্টান্ত দেখাই।

"শারদচন্দ্র পবন মন্দ বিপিন ভরল কুসুম গন্ধ"

এরই প্রত্যেকটি হল চলন। এমন আটটি চলনে এই ছন্দের চাল সারা হচ্চে। অর্থাৎ ছয়ের মাত্রায় এ পা ফেল্‌চে এবং আটের মাত্রায় ঘুরে আস্‌চে। "শারদ চন্দ্র" এই কথাটি ছয় মাত্রার, "শারদ" তিন এবং "চন্দ্র"ও তিন। বলা বাহুল্য, যুক্ত অক্ষরে দুই অক্ষরের মাত্রা আছে, এই কারণে "শারদ চন্দ্র" এবং "বিপিন ভরল" ওজনে একই।

১ ২ ৩ ৪
শারদ চন্দ্র পবন মন্দ, বিপিন ভরল কুসুম গন্ধ,
৫ ৬ ৭ ৮
ফুল্ল মল্লি, মালতি যুথি, মত্ত মধুপ ভোরণী।

প্রদক্ষিণের মাত্রার চেয়ে পদক্ষেপের মাত্রার পরেই ছন্দের বিশেষত্ব বেশি নির্ভর করচে। কেননা এই আট পদক্ষেপের আবর্ত্তন সকল ছন্দেই চলে। বস্তুত এইটেই হচ্চে অধিকাংশ ছন্দের চলিত কায়দা। যথা,

১ ২ ৩ ৪
মহাভার- তের কথা অমৃত স- মান
৫ ৬ ৭ ৮
কাশিরাম দাস কহে শুনে পুণ্য- বান।

এও আট পদক্ষেপ।

১ ২ ৩ ৪
(To) night the winds be- gin to rise
৫ ৬ ৭ ৮
(And) roar from yonder dropping day

এই কবিতার প্রদক্ষিণের মাত্রাভাগও আট, আবার

১ ২ ৩ ৪
When we two parted in silence and tears
৫ ৬ ৭ ৮
Half broken hearted to sever for years

এ কবিতারও তাই। কিন্তু কানে শোন্‌বামাত্রই বোঝা যায় এরা ভিন্ন জাতের ছন্দ।

এই জাত নির্ণয় করতে হলে চালের দিকে ততটা নয় কিন্তু চলনের দিকেই দৃষ্টি দিতে হবে। দিলে দেখা যাবে, ছন্দকে মোটের উপর তিন জাতে ভাগ করা যায়। সম-চলনের ছন্দ, অসম-চলনের ছন্দ এবং বিষম-চলনের ছন্দ। দুই মাত্রার চলনকে বলি সম-মাত্রার চলন, তিন মাত্রার চলনকে বলি অসম মাত্রার চলন এবং দুই তিনের মিলিত মাত্রার চলনকে বলি বিষম মাত্রার ছন্দ।

ফিরে ফিরে আঁখি নীরে পিছু পানে চায়।
পায়ে পায়ে বাধা পড়ে চলা হল দায়।

এ হল দুই মাত্রার চলন। দুইয়ের গুণফল চার বা আটকেও আমরা এক জাতিরই গণ্য করি।

নয়ন ধারায় পথ সে হারায়, চায় সে পিছন পানে,
চলিতে চলিতে চরণ চলে না, ব্যথার বিষম টানে।

এ হল তিন মাত্রার চলন। আর

যতই চলে চোখের জলে নয়ন ভরে ওঠে,
চরণ বাধে, পরাণ কাঁদে, পিছনে মন ছোটে।

এ হল দুই তিনের যোগে বিষম মাত্রার ছন্দ।

তা হলেই দেখতে পাওয়া যাচ্চে চলনের ভেদেই ছন্দের প্রকৃতি-ভেদ। আমরা যে-দুটি ইংরেজি কবিতা উপরে উদ্ধৃত করেছি—তার মধ্যে একটার চলন সমমাত্রার অর্থাৎ দুই মাত্রার—অন্যটার চলন অসম মাত্রার অর্থাৎ তিন মাত্রার—তাল দিয়ে গুণে দেখলেই সেটা ধরা পড়বে। ইংরেজিতে বিষম মাত্রার ছন্দ আমার চোখে পড়ে নি।

বৈষ্ণব পদাবলীতে বাংলা সাহিত্যে ছন্দের প্রথম ঢেউ ওঠে। কিন্তু দেখা যায় তার লীলাবৈচিত্র্য সংস্কৃত ছন্দের দীর্ঘ হ্রস্ব মাত্রা অবলম্বন করেই প্রধানত প্রকাশ পেয়েচে। প্রাকৃত বাংলায় যত কবিতা আছে তার ছন্দ সংখ্যা বেশি নয়। সম মাত্রার ছন্দের দৃষ্টান্ত ঃ—

কেন তোরে আনমন দেখি।
কাহে নখে ক্ষিতিতল লেখি।

এ ছাড়া পয়ার এবং ত্রিপদী আছে—সেও সম মাত্রার ছন্দ।

অসম মাত্রার অর্থাৎ তিনের ছন্দ চার রকমের পাওয়া যায়—

১। মলিন বদন ভেল,
ধীরে ধীরে চলি গেল।
আওল রাইর পাশ।
কি কহিব জ্ঞান দাস।

২। জাগিয়া জাগিয়া হইল খীন
অসিত চাঁদের উদয় দিন॥

৩। সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়ন তারা।
বিরতি আহারে রাঙা বাস পরে
যেমত যোগিনী পারা।

৪। বেলি অবসান কালে
কবে গিয়াছিলা জলে।
তাহারে দেখিয়া ইষত হাসিয়া ধরিলি সখীর গলে॥

বিষম মাত্রার দৃষ্টান্ত কেবল একটা চোখে পড়েচে—সেও কেবল গানের আরম্ভে—শেষ পর্য্যন্ত টেঁকে নি।

চিকনকালা গলায় মালা
বাজন নূপুর পায়।
চূড়ার ফুলে ভ্রমর বুলে
তেরছ নয়ানে চায়॥

বাংলায় সম মাত্রার ছন্দের মধ্যে পয়ার এবং ত্রিপদীই সব চেয়ে প্রচলিত। এই দুটি ছন্দের বিশেষত্ব হচ্চে এই যে এদের চলন খুব লম্বা। এদের প্রত্যেক পদক্ষেপে আট মাত্রা। এই আট মাত্রার মোট ওজন রেখে পাঠক এর মাত্রাগুলিকে অনেকটা ইচ্ছামত চালা-চালি করতে পারেন।

"পাষাণ মিলায়ে যায় গায়ের বাতাসে।"

এর মধ্যে যে কতটা ফাঁক আছে তা যুক্তাক্ষর বসালেই টের পাওয়া যায়।

"পাষাণ মূর্চ্ছিয়া যায় গায়ের বাতাসে।"

ভারি হল না।

"পাষাণ মূর্চ্ছিয়া যায় অঙ্গের বাতাসে।"

এতেও বিশেষ ভিড় বাড়ল না।

"পাষাণ মূর্চ্ছিয়া যায় অঙ্গের উচ্ছ্বাসে।"

এও বেশ সহ্য হয়।

"সঙ্গীত তরঙ্গি উঠে অঙ্গের উচ্ছ্বাসে।"

এতেও অত্যন্ত ঠেসাঠেসি হল না।

"সঙ্গীত তরঙ্গ রঙ্গ অঙ্গের উচ্ছ্বাস।"

অনুপ্রাসের ভিড় হল বটে কিন্তু এখনো অন্ধকূপ হত্যা হবার মত হয় নি। কিন্তু এর বেশি আর সাহস হয় না। তবু যদি আরো প্যাসেঞ্জার নেওয়া যায় তাহলে যে একেবারে পয়ারের নৌকাডুবি হবে তা নয়, তবে কিনা হাঁপ ধরবে—যথা,

দুর্দ্দান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত।

কিন্তু দুই মাত্রার ছন্দ মাত্রেরই যে এই রকম অসাধারণ শোষণ-শক্তি তা বলতে পারি নে। যেখানে পদক্ষেপ ঘন ঘন সেখানে ঠিক উল্টো। যথা—

২ ২ ২ ২ ২ ২ ২
ধরণীর আঁখিনীর মোচনের ছলে,
২ ২ ২ ২ ২ ২ ২
দেবতার অবতার বসুধার তলে।

এও পয়ার কিন্তু যেহেতু এর পদক্ষেপ আটে নয়, দুইয়ে, সেইজন্যে এর উপরে বোঝা সয় না। যে দ্রুত চলে তাকে হাল্কা হতে হয়। যদি লেখা যায়,

ধরিত্রীর চক্ষুনীর মুঞ্চনের ছলে,
কংসারির শঙ্খ-রব সংসারের তলে—

তাহলে ও একটা স্বতন্ত্র ছন্দ হয়ে যায়। সংস্কৃতেও দেখ, সম মাত্রার ছন্দ যেখানে দুয়ের লয়ে চলে সেখানে দৌড় বেশি—যেমন—

২ ২ ২ ২ ২ ২ ২
হরি রিহ বিহরতি সরস বসন্তে।

ইংরেজিতেও তাই—

১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২
Ah dis- | tinctly | I re- | member |
১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২
It was | in the | bleak De- | cember |

বাংলা পয়ারের মত এদের গম্ভীর মন্থর চলন নয়। কিন্তু ঐ ইংরেজিতে দুইয়ের চলনের বদলে চারের চলন যেখানে আসে সেখানে কেবল যে মন্থরতা, তা নয়, ছন্দের স্বাধীনতা বাড়ে। যেমন—

১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪ ১ ২
(O) Goddess, hear these | tuneless numbers, | wrung
১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪ ১ ২
(By) sweet enforcement | and remembrance | dear, |

এই খানে বলা আবশ্যক wrung এবং dear শব্দকে দুই মাত্রা বলে গণ্য করেচি, তার কারণ উচ্চারিত syllableএর এক মাত্রার সঙ্গে বিরামের এক মাত্রা যোগ না করলে ছন্দ সম্পূর্ণ হয় না।

অসম অর্থাৎ তিন মাত্রার চলনও দ্রুত।

পাষাণ মিলায় গায়ের বাতাসে—

এর লয়টা দুরন্ত। পড়লেই বোঝা যায় এর প্রত্যেক তিন মাত্রা পরবর্ত্তী তিন মাত্রাকে চাচ্চে, কিছুতে তর সচ্চে না। তিনের মাত্রাটা টলটলে—গড়িয়ে যাবার দিকে তার ঝোঁক। এইজন্যে তিনকে গুণ করে ছয় বা বারো করলেও তার চাপল্য ঘোচে না। দুই মাত্রার চলন ক্ষিপ্র, তিন মাত্রার চঞ্চল, চার মাত্রার মন্থর, আট মাত্রার গম্ভীর। তিন মাত্রার ছন্দে যে পয়ারের মত ফাঁক নেই তা যুক্তাক্ষর জুড়তে গেলেই ধরা পড়বে। যথা—

গিরির গুহায় ঝরিছে নিঝর

এই পদটিকে যদি লেখা যায়

পর্ব্বত কন্দরে ঝরিছে নির্ঝর

তাহলে ছন্দের পক্ষে সাংঘাতিক হয়। অথচ পয়ারে

গিরি গুহাতল বেয়ে ঝরিছে নিঝর

এবং

পর্ব্বত কন্দর তলে ঝরিছে নির্ঝর

ছন্দের পক্ষে দুইই সমান।

বিষম মাত্রার ছন্দের স্বভাব হচ্চে তার প্রত্যেক পদে এক অংশে গতি, আর এক অংশে বাধা। এই গতি এবং বাধার সম্মিলনে তার নৃত্য।

"অহহ কল- য়ামি বল- য়াদি মণি ভূষণং
হরি বিরহ দহন বহ- নেন বহু দূষণং।"

তিন মাত্রার "অহহ" যে ছাঁদে চলবার জন্যে বেগ সঞ্চয় করলে, দুই মাত্রার "কল" তাকে হঠাৎ টেনে থামিয়ে দিলে—আবার পরক্ষণেই তিন যেই নিজমূর্ত্তি ধরলে অমনি আবার দুই এসে তার লাগামে টান দিলে। এই বাধা যদি সত্যকার বাধা হত, তাহলে ছন্দই হত না—এ কেবল বাধার ছল, এতে গতিকে আরো উস্কিয়ে দেয় এবং বিচিত্র করে তোলে। এইজন্যে অন্য ছন্দের চেয়ে বিষম মাত্রার ছন্দে গতিকে আরো যেন বেশি অনুভব করা যায়।

যাই হোক্ আমার বক্তব্য এই, ছন্দের পরিচয়ের মূলে দুটি প্রশ্ন আছে। এক হচ্চে তার প্রত্যেক পদক্ষেপে ক'টি করে মাত্রা আছে। দুই হচ্চে, সে মাত্রা সম, অসম, না বিষম অথবা সম-বিষমের যোগ। আমরা যখন মোটা করে বলে থাকি যে, এটা চোদ্দ মাত্রার ছন্দ, বা ওটা দশ মাত্রার তখন আসল কথাটাই বলা হয় না। তার কারণ পূর্ব্বেই বলেচি চাল অর্থাৎ প্রদক্ষিণের মাত্রায় ছন্দকে চেনা

যায় না—চলন অর্থাৎ পদক্ষেপের মাত্রায় তার পরিচয়। চোদ্দ মাত্রায় শুধু যে পয়ার হয় না, আরো অনেক ছন্দ হয় তার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্।

বসন্ত পাঠায় দূত রহিয়া রহিয়া,
যে কাল গিয়েছে তারি নিশ্বাস বহিয়া।

এই ত পয়ার—এর প্রত্যেক প্রদক্ষিণে দুটি পদক্ষেপ। প্রথম পদক্ষেপে আটটি উচ্চারিত মাত্রা, দ্বিতীয় পদক্ষেপে ছয়টি উচ্চারিত মাত্রা এবং দুটি অনুচ্চারিত অর্থাৎ যতির মাত্রা। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রদক্ষিণে মোটের উপর উচ্চারিত মাত্রা চোদ্দ। আমরা পয়ারের পরিচয় দেওয়ার কালে প্রত্যেক প্রদক্ষিণের উচ্চারিত মাত্রার সমষ্টির হিসাব দিয়ে থাকি। তার প্রধান কারণ, কিছুকাল পূর্ব্বে পয়ার ছাড়া চোদ্দ মাত্রা-সমষ্টির ছন্দ আমাদের ব্যবহারে লাগ্‌ত না। নিম্নলিখিত চোদ্দ মাত্রার ছন্দেও ঠিক পয়ারের মতই প্রত্যেক প্রদক্ষিণে দুটি করে পদক্ষেপ ঃ—

ফাগুন এল দ্বারে কেহ যে ঘরে নাই,
পরাণ ডাকে কারে ভাবিয়া নাহি পাই।

অথচ এটা মোটেই পয়ার নয়। তফাৎ হল কিসে যাচাই করে দেখলে দেখা যাবে যে এর প্রতি পদক্ষেপে আটের বদলে সাত উচ্চারিত মাত্রা। আর অনুচ্চারিত মাত্রা প্রতি পদক্ষেপের শেষে একটি করে দেওয়া যেতে পারে—যেমন,

"ফাগুন এল দ্বারে-এ কেহ যে ঘরে না-আ ই।" কিম্বা কেবল শেষ ছেদে একটি দেওয়া যেতে পারে, যেমন, "ফাগুন এল দ্বারে কেহ যে ঘরে না-আ-ই।" কিম্বা যতি একেবারেই না দেওয়া যেতে পারে।

পুনশ্চ এই ছন্দেরই মাত্রাসমষ্টি সমান রেখে এরই পদক্ষেপ-মাত্রার পরিবর্ত্তন করে যদি পড়া যায় তাহলে শ্লোকটি চোখে দেখতে একই রকম থাকবে কিন্তু কানে শুন্‌তে অন্য রকম হবে। এই খানে বলে রাখি, ছন্দের প্রত্যেক ভাগে একটা করে তালি দিলে পড়বার সুবিধা হবে এবং এই তালি অনুসারে ভিন্ন ছন্দের ভিন্ন লয় ধরা পড়বে। প্রথমে সাত মাত্রাকে তিন এবং চারে স্বতন্ত্র ভাগ করে পড়া যাক্—যেমন,

তালি তালি তালি তালি
ফাগুন এল দ্বারে কেহ যে ঘরে নাই,
পরাণ ডাকে কারে ভাবিয়া নাহি পাই।

তারপরে পাঁচ দুই ভাগ করা যাক্ যেমন,—

তালি তালি তালি তালি
ফাগুন এল দ্বারে কেহ যে ঘরে নাই,
পরাণ ডাকে কারে ভাবিয়া নাহি পাই।

এই চোদ্দ মাত্রাসমষ্টির ছন্দ আরো কত রকম হতে পারে তার কতকগুলি নমুনা দেওয়া যাক্ ঃ—দুই পাঁচ দুই পাঁচ ভাগের ছন্দ—যথা—

। । ।
সে যে আপন মনে শুধু দিবস গণে *
তার চোখের বারি কাঁপে আঁখির কোণে।

চার তিন চার তিন ভাগ—

। । । ।
নয়নের সলিলে যে কথাটি বলিলে
রবে তাহা স্মরণে জীবনে ও মরণে।

* এই প্রত্যেক দণ্ডচিহ্নের অনুসরণ করে তাল দেওয়া আবশ্যক।

কিম্বা এক ছয় এক ছয় ভাগ—

। । । ।
যে কথা নাহি শোনে সে থাক্ নিজমনে
কে বৃথা নিবেদনে রে ফিরে তার সনে।

সাত চার তিনের ভাগ—

। । ।
চাহিছ বারে বারে আপনারে ঢাকিতে,
মন না মানে মানা মেলে ডানা আঁখিতে।

এই কবিতাটাকেই অন্য লয়ে পড়া যায়—

। । । ।
চাহিছ বারে বারে আপনারে ঢাকিতে,
মন না মানে মানা মেলে ডানা আঁখিতে।

তিন তিন তিন তিন দুইয়ের ভাগ—

। । । । ।
ব্যাকুল বকুল ঝরিল পড়িল ঘাসে,
বাতাস উদাস আমের বোলের বাসে।

এ'কেই ছয় আটের ভাগে পড়া যায়—

। ।
ব্যাকুল বকুল ঝরিল পড়িল ঘাসে।
বাতাস উদাস আমের বোলের বাসে॥

পাঁচ চার পাঁচের ভাগ—

। । ।
নীরবে গেলে ম্লান-মুখে আঁচল টানি,
কাঁদিছে দুখে মোর বুকে না-বলা বাণী।

এই শ্লোককেই তিন ছয় পাঁচ ভাগ করা যায়—

। । ।
নীরবে গেলে ম্লান-মুখে আঁচল টানি
কাঁদিছে দুখে মোর বুকে না-বলা বাণী।

এর থেকে এই বোঝা যাচ্চে, প্রদক্ষিণের সমষ্টি মাত্রা চোদ্দ হলেও সেই সমষ্টির অংশের হিসাব কে কি ভাবে নিকাস করচে তারই উপর ছন্দের প্রভেদ ধরা পড়ে। কেবল ছন্দ-রসায়নে নয়, বস্তু-রসায়নেও এইরকম উপাদানের মাত্রাভাগ নিয়েই বস্তুর প্রকৃতি-ভেদ ঘটে রাসায়নিকেরা বোধ করি এই কথা বলেন।

পয়ার ছন্দের বিশেষত্ব হচ্চে এই যে, তাকে প্রায় গাঁঠে গাঁঠে ভাগ করা চলে, এবং প্রত্যেক ভাগেই মূল ছন্দের একটা আংশিক রূপ দেখা যায়। যথা,—

ওহে পান্থ, চল পথে, পথে বন্ধু আছে
একা বসে ম্লান-মুখে, সে যে সঙ্গ যাচে।

"ওহে পান্থ"—এইখানে একটা থামবার ষ্টেশন মেলে। তার পরে যথাক্রমে, "ওহে পান্থ চল",—"ওহে পান্থ চল পথে", "ওহে পান্থ চল পথে পথে।" তার পরে "বন্ধু আছে" এই ভগ্নাংশটার সঙ্গে পরের লাইন জোড়া যায়—যেমন, "বন্ধু আছে একা", "বন্ধু আছে একা বসে", "বন্ধু আছে একা বসে সে যে।" কিন্তু তিনের ছন্দকে তার ভাগে ভাগে পাওয়া যায় না, এই জন্যে তিনের ছন্দে ইচ্ছামত থামা চলে না। যেমন, "নিশি দিল ডুব অরুণ সাগরে।" "নিশি দিল", এখানে থামা যায়—কিন্তু তাহলে তিনের ছন্দ ভেঙে যায়—"নিশি দিল ডুব" পর্য্যন্ত এসে ছয় মাত্রা পূরিয়ে দিয়ে তবেই তিনের ছন্দ হাঁফ ছাড়তে পারে।

কিন্তু আবার, "নিশি দিল ডুব অরুণ" এখানেও থামা যায় না, কেননা, তিন এমন একটি মাত্রা, যা আর একটা তিনকে পেলে তবে দাঁড়াতে পারে, নইলে টলে' পড়তে চায়—এই জন্য "অরুণ-সাগর"-এর মাঝখানে থামতে গেলে রসনা কূল পায় না। তিনের ছন্দে গতির প্রাবল্যই বেশি, স্থিতি কম। সুতরাং তিনের ছন্দ চাঞ্চল্য প্রকাশের পক্ষে ভাল কিন্তু তাতে গাম্ভীর্য্য এবং প্রসারতা অল্প। তিনের মাত্রার ছন্দে অমিত্রাক্ষর রচনা করতে গেলে বিপদে পড়তে হয়—সে যেন চাকা নিয়ে লাঠি খেলার চেষ্টা। পয়ার আট পায়ে চলে বলে তাকে যে কত রকমে চালানো যায় মেঘনাদবধকাব্যে তার প্রমাণ আছে। তার অবতারণাটি পরখ করে' দেখা যাক্। এর প্রত্যেক ভাগে কবি ইচ্ছামত ছোট বড় নানা ওজনের নানা সুর বাজিয়েচেন; কোনো জায়গাতেই পয়ারকে তার প্রচলিত আড্ডায় এসে থামতে দেন নি। প্রথম আরম্ভেই বীরবাহুর বীরমর্য্যাদা সুগম্ভীর হ'য়ে বাজ্‌ল—"সম্মুখ সমরে পড়ি বীরচূড়ামণি বীরবাহু" তার পরে তার অকাল মৃত্যুর সংবাদটি যেন ভাঙা রণ-পতাকার মত ভাঙা ছন্দে ভেঙে পড়ল—"চলি যবে গেলা যমপুরে অকালে"—তার পরে ছন্দ নত হয়ে নমস্কার করলে, "কহ হে দেবি অমৃত-ভাষিণি" তার পরে আসল কথাটা, যেটা সব চেয়ে বড় কথা—সমস্ত কাব্যের ঘোর পরিণামের যেটা সূচনা, সেটা যেন আসন্ন ঝটিকার সুদীর্ঘ মেঘ-গর্জ্জনের মত এক দিগন্ত থেকে আর-এক দিগন্তে উদ্ঘোষিত হ'ল—"কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি-পদে পাঠাইলা রণে পুন রক্ষঃকুলনিধি রাঘবারি।"

বাংলা ভাষায় অধিকাংশ শব্দই দুই মাত্রার এবং তিন মাত্রার, এবং ত্রৈমাত্রিক শব্দের উপর বিভক্তি যোগে চার মাত্রার। পয়ারের পদ

বিভাগটি এমন যে, দুই, তিন এবং চার মাত্রার শব্দ তাতে সহজেই জায়গা পায়।

চৈত্রের সেতারে বাজে বসন্ত বাহার,
বাতাসে বাতাসে ওঠে তরঙ্গ তাহার।

এ পয়ারে তিন অক্ষরের ভিড়। আবার

চকমকি-ঠোকাঠুকি-আগুনের প্রায়,
চোখোচোখি ঘটিতেই হাসি ঠিকরায়।

এই পয়ারে চারের প্রাধান্য।

তারাগুলি সারারাতি কানে কানে কয়।
সেই কথা ফুলে ফুলে ফুটে বনময়।

এই খানে দুই মাত্রার আয়োজন।

প্রেমের অমরাবতী প্রেয়সীর প্রাণে,
কে সেথা দেবাধিপতি সে কথা কে জানে।

এই পয়ারে এক থেকে পাঁচ পর্য্যন্ত সকল রকম মাত্রারই সমাবেশ। এর থেকে জানা যায় পয়ারের আতিথেয়তা খুব বেশি আর সেই জন্যেই বাংলা কাব্য সাহিত্যে প্রথম থেকেই পয়ারের এত অধিক চলন।

পয়ারের চেয়ে লম্বা দৌড়ের সমমাত্রার ছন্দ আজকাল বাংলা-কাব্যে চলচে। স্বপ্ন-প্রয়াণে এর প্রথম প্রবর্ত্তন দেখা গেছে। স্বপ্ন-প্রয়াণ থেকেই তার নমুনা তুলে দেখাই—

গম্ভীর পাতাল, যেথা কালরাত্রি করাল বদনা
বিস্তারে একাধিপত্য। শ্বসয়ে অযুত ফণিফণা
দিবানিশি ফাটি' রোষে; ঘোর-নীল বিবর্ণ অনল

শিখা-সঙ্ঘ আলোড়িয়া দাপাদাপি করে দেশময়
তমো-হস্ত এড়াইতে—প্রাণ যথা কালের কবল।

উচ্চারিত এবং অনুচ্চারিত মাত্রা নিয়ে পয়ার যেমন আট পদমাত্রায় সমান দুই ভাগে বিভক্ত এ তা নয়। এর একভাগে উচ্চারিত মাত্রা আট, অন্যভাগে উচ্চারিত মাত্রা দশ। এই রকম অসমান ভাগে ছন্দের গাম্ভীর্য্য বাড়ে। ছন্দে পদে পদে ঠিক সমান ওজন দাবি করা কানের যেন একটা বাঁধা মৌতাতের মত দাঁড়ায়, সেইটি ভেঙে দিলে ছন্দের গৌরব আরো বাড়ে। ইংরেজি কাব্যে এর অনেক দৃষ্টান্ত দেখ্‌তে পাই।

১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪
(O) Wild West Wind, thou। breath of Autumn's
৫ ৬
being।

এর প্রথম ভাগে চার মাত্রা, দ্বিতীয় ভাগে যতিসমেত ছয় মাত্রা। মিল্‌টনের

Hail holy light, ofspring of Heaven's first-born

এও এই ছন্দে। সংস্কৃত মন্দাক্রান্তার অসমান ভাগের গাম্ভীর্য্য সবাই জানেন—

কশ্চিৎকান্তা বিরহ গুরুণা স্বাধিকার প্রমত্তঃ

এর প্রথম ভাগে আট, দ্বিতীয় ভাগে সাত, তৃতীয় ভাগে সাত, এবং চতুর্থ ভাগে চার মাত্রা। এমনতর ভাগে কানের কোনো সঙ্কীর্ণ অভ্যাস হবার জো নেই।

সংস্কৃতের সঙ্গে সাধু বাংলা সাহিত্যের ছন্দের যে-একটি বিশেষ প্রভেদ আছে সেইটির কথা এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক্। সংস্কৃত উচ্চারণের বিশেষত্ব হচ্চে তার ধ্বনির দীর্ঘ হ্রস্বতা। সেইজন্য সংস্কৃত ছন্দ কেবলমাত্র পদক্ষেপের মাত্রা গণনা করেই নিশ্চিন্ত থাকে না, নির্দ্দিষ্ট নিয়মে দীর্ঘ হ্রস্ব মাত্রাকে সাজানো তার ছন্দের অঙ্গ। আমি একটি বাংলা বই থেকে এর দৃষ্টান্ত তুলচি। বইটির নাম ছন্দঃ কুসুম। আজ চুয়ান্ন বছর পূর্ব্বের এটি রচনা। লেখক ভুবন মোহন রায় চৌধুরী রাধাকৃষ্ণের লীলাচ্ছলে বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ছন্দের দৃষ্টান্ত দিয়ে ছন্দ শিক্ষা দেবার চেষ্টা করেচেন। কৃষ্ণবিরহিণী রাধা কালো রংটারই দূষণীয়তা প্রমাণ করবার জন্যে যখন কালো কোকিল কালো ভ্রমর কালো পাথর কালো লোহার নিন্দা করলেন তখন অপর পক্ষের উকীল লোহার দোষ ক্ষালন করতে প্রবৃত্ত হলেন—

॥ । । ॥ । । ॥ । । ॥ । । ॥ । । ॥ । । ॥ । । ॥ । ।
দেখহ সুন্দর লৌহ র থে চড়ি লৌহ প থে কত লোক চ লে
ষষ্ঠ মু হূর্ত্তক ম ধ্য করে গতি যোজন পঞ্চদশের পথে।
লৌহ-বিনির্ম্মিত তার তরে বহুদূর-অবস্থিত লোক সবে
দূর অবস্থিত বন্ধুসনে সুখচিত্ত পরস্পর বাক্য কহে।

এই কবিতাটির যুক্তি ও আধ্যাত্মিক রসমাধুর্য্যের বিচার ভার আধুনিক কালের বস্তুতান্ত্রিক উকীল রসিকদের উপর অর্পণ করা গেল—তা ছাড়া লোকশিক্ষায় এর প্রয়োজনীয়তার তর্ক তোলবার অধিকারীও আমি নই। আমি ছন্দের দিক দিয়ে বল্‌চি—এর প্রত্যেক পদভাগে একটি দীর্ঘ ও দুইটি হ্রস্ব মাত্রা—সেই দীর্ঘ হ্রস্বের ওঠা-পড়ার পর্য্যায়ই হচ্চে এই ছন্দের প্রকৃতি। বাংলায় স্বরের দীর্ঘ হ্রস্বতা

নাই কিম্বা নাই বল্লেই হয় এবং যুক্ত ব্যঞ্জনকে সাধু বাংলা কোন গৌরব দেয় না—অযুক্তের সঙ্গে একই বাট্‌খারায় তার ওজন চলে। অতএব মাত্রা সংখ্যা মিলিয়ে ঐ লোহার স্তব যদি বাংলা ছন্দে লেখা যায় তাহলে তার দশা হয় এই :—

দেখ দেখ মনোহর লোহার গা- ড়িতে চড়ি
লোহা পথে কত শত মানুষ চ- লিছে।
দেখিতে দে- খিতে তারা যোজন যো- জন পথ
অনায়াসে তরে' যায় টিকিট কি- নিয়া।
যে সব মানুষ আছে অনেক দূরের দেশে,
লোহা দিয়ে গড়া তার রয়েছে বলিয়া
সুদূর বঁধুর সাথে কত যে মনের সুখে
কথা চালাচালি করে নিমেষে নিমেষে।

বাংলায় আর সবই রইল—মাত্রাও রইল, আর সম্ভবত আধ্যাত্মিকতারও হানি হয় নি—কেননা ভক্তির টিকিট থাকলে লোহার গাড়ি যে কঠিন লোহার পথও তরিয়ে দেয় এবং বঁধুর সঙ্গে যতই দূরত্ব থাক স্বয়ং লোহার তারে তাদের কথা চালাচালি হতে পারে এ ভাবটা বাংলাতেও প্রকাশ পাচ্চে—কিন্তু মূল ছন্দের প্রকৃতিটা বাংলায় রক্ষা পায় নি। এ কেমন, যেমন ঢেউ-খেলানো দেশের জমির পরিমাণ সমতল দেশে জরিপের দ্বারা মিলিয়ে নেওয়া। তাতে জমি পাওয়া গেল কিন্তু ঢেউ পাওয়া গেল না। অথচ ঢেউটা ছন্দের একটা প্রধান জিনিস। সমতল বাংলা আপন কাব্যের ভাষাকে সমতল করে দিয়েচে। এ হচ্চে কাজকে সহজ করবার একটা কৃত্রিম বাঁধা নিয়ম। আমরা যখন বলি থার্ডক্লাসের ছেলে, তখন মনে ধরে নিই যেন সব ছেলেই

সমান মাত্রার। কিন্তু আসলে থার্ড-ক্লাসের আদর্শকে যদি একটা সরল রেখা বলে ধরে নিই তবে কোনো ছেলে সেই রেখার উপরে চড়ে কেউবা তার নীচে নামে। ভাল শিক্ষা প্রণালী তাকেই বলে যাতে প্রত্যেক ছেলেকে তার নিজের স্বতন্ত্র বুদ্ধি ও শক্তির মাত্রা অনুসারে ব্যবহার করা যায়—থার্ড-ক্লাসের একটা কাল্পনিক মাত্রা ক্লাসের সকল ছেলের উপরে সমান ভাবে আরোপ না করা যায়। কিন্তু কাজ সহজ করবার জন্য বহু অসমানকে এক সমান কাঠগড়ায় বন্দী করবার নিয়ম আছে। সাধু বাংলার ছন্দে তারই প্রমাণ পাই। হলন্তই হোক্ হসন্তই হোক্ আর যুক্তবর্ণই হোক এই ছন্দে সকলেরই সমান মাত্রা।

অথচ প্রাকৃত বাংলার প্রকৃতি সমতল নয়। সংস্কৃতের নিয়মে না হোক নিজের নিয়মে তার একটা ঢেউ খেলা আছে। তার কথার সকল অংশ সমান ওজনের নয়। বস্তুতঃ পদেপদেই তার শব্দ বন্ধুর হয়ে ওঠে। তার কারণ, প্রাকৃত বাংলায় হসন্তের প্রাদুর্ভাব খুব বেশি। এই হসন্তের দ্বারা ব্যঞ্জন বর্ণের মধ্যে সংঘাত জন্মাতে থাকে—সেই সংঘাতে ধ্বনি গুরু হয়ে ওঠে। প্রাকৃত বাংলার এই গুরুধ্বনির প্রতি যদি সদ্ব্যবহার করা যায় তাহলে ছন্দের সম্পদ বেড়ে যায়। প্রাকৃত বাংলার দৃষ্টান্ত

বৃষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্ নদেয় এল বান্
শিব্ ঠাকুরের্ বিয়ে হবে তিন্ কন্যে দান্
এক্ কন্যে রাঁধেন্ বাড়েন্ এক্ কন্যে খান্
এক্ কন্যে না পেয়ে বাপের্ বাড়ি যান্।

এই ছড়াটিতে দুটি জিনিস দেখবার আছে। এক হচ্চে বিসর্গের ঘট-কালিতে ব্যঞ্জনের সঙ্গে ব্যঞ্জনের সম্মিলন—আর এক হচ্ছে "বৃষ্টি" এবং

"কন্যে" কথার যুক্ত বর্ণকে যথোচিত মর্য্যাদা দেওয়া। এই ছড়া সাধু বাংলার ছন্দে বাঁধলে পালিস করা আব্লুস কাঠের মত পিছল হয়ে ওঠে।

বারি ঝরে ঝর ঝর নদিয়ায় বান
শিবুঠাকুরের বিয়ে তিন মেয়ে দান।
এক মেয়ে রাঁধিছেন এক মেয়ে খান,
এক মেয়ে ক্ষুধাভরে পিতৃঘরে যান।

এতে যুক্ত বর্ণের সংযোগ হলেও ছন্দের উল্লাস তাতে বিশেষ বাড়ে না। যথা—

মন্দ মন্দ বৃষ্টি পড়ে, নবদ্বীপে বান,
শিবুঠাকুরের বিয়া তিন কন্যা দান।
এক কন্যা রান্ধিছেন, এক কন্যা খান,
এক কন্যা ঊর্দ্ধশ্বাসে পিতৃগৃহে যান।

এই সব যুক্ত বর্ণের যোগে এ ছন্দ বন্ধুর হয়ে উঠেচে বটে কিন্তু তরঙ্গিত হয় নি—কেন না যুক্ত বর্ণ যথেচ্ছা ছড়ানো হয়েচে মাত্র, তাদের মর্য্যাদা অনুসারে জায়গা দেওয়া হয়নি। অর্থাৎ হাটের মধ্যে ছোটয় বড়য় যেমন গায়ে গায়ে ভিড় করে তেমনি, সভার মধ্যে যেমন তারা যথাযোগ্য আসন পায় তেমন নয়।

ছন্দঃকুসুম বইটির লেখক প্রাকৃত বাংলার ছন্দ সম্বন্ধে অনুষ্টুভ ছন্দে বিলাপ করে বল্‌চেন—

পাঁচালী নাম বিখ্যাতা, সাধারণ মনোরমা
পয়ার ত্রিপদী আদি প্রাকৃতে হয় চালনা।

দ্বিপাদে শ্লোক সম্পূর্ণ তুল্য সংখ্যার অক্ষরে,
পাঠে দুই পদে মাত্র শেষাক্ষর সদা মিলে।
পঠনে সে সব ছন্দঃ রাখিতে তাল গৌরব
পঠিছে সর্ব্বদা লোকে উচ্চারণ-বিপর্য্যয়ে।
লঘুকে গুরু সম্ভাষে দীর্ঘবর্ণে কহে লঘু,
হ্রস্বে দীর্ঘে সমজ্ঞানে উচ্চারণ করে সবে।

কবির এই বিলাপের সঙ্গে আমিও যোগ দিচ্চি। কেবল আমি এই বল্‌তে চাই প্রাকৃত বাংলার ছন্দে এমনতর দুর্ঘটনা ঘটে না, এ সব ঘটে সংস্কৃত বাংলার ছন্দে। প্রাকৃত বাংলার যে স্বকীয় দীর্ঘ-হ্রস্বতা আছে তার ছন্দে তার বিপর্য্যয় দেখিনে কিন্তু সাধু ভাষায় দেখি।

এই প্রাকৃত বাংলা মেয়েদের ছড়ায় বাউলের গানে রামপ্রসাদের পদে আপন স্বভাবে প্রকাশ পেয়েচে। কিন্তু সাধু সভায় তার সমাদর হয় নি বলে সে মুখ ফুটে নিজের সব কথা বল্‌তে পারে নি এবং তার শক্তি যে কত তারও সম্পূর্ণ পরিচয় হল না। আজকের দিনের ডিমক্রেসির যুগেও সে ভয়ে ভয়ে দ্বিধা করে চলেচে; কোথায় যে তার পংক্তি এবং কোথায় নয় তা স্থির হয়নি। এই সঙ্কোচে তার আত্ম পরিচয়ের খর্ব্বতা হচ্চে। একদিন বাঙালীকে বলা হত বাঙালী কেরাণীগিরি করতে পারে, বিশুদ্ধ বিশেষত অবিশুদ্ধ ইংরেজি লিখ্‌তে ও বলতে তার বাহাদুরী আছে কিন্তু সে রাষ্ট্রশাসন কিম্বা যুদ্ধ করতে পারে না। এমন অবিশ্বাস ও সন্দেহের কথা যত দিন বলা হবে, ততদিন আমাদের শক্তির প্রমাণ হবে না। প্রাকৃত বাংলাকেও সেইরকম অবজ্ঞা ও অবিশ্বাসের উপর রাখা হয়েচে সেই জন্যে তার পূর্ণ পরিচয় হচ্চে না। আমরা একটা কথা ভুলে যাই প্রাকৃত বাংলার লক্ষ্মীর পেট্‌রায় সংস্কৃত, পারসী ইংরেজি প্রভৃতি নানা

ভাষা থেকেই শব্দ সঞ্চয় হচ্চে—সেই জন্যে শব্দের দৈন্য প্রাকৃত বাংলার স্বভাবগত বলে মনে করা উচিত নয়। প্রয়োজন হলেই আমরা প্রাকৃত ভাণ্ডারে সংস্কৃত শব্দের আমদানি করতে পারব। কাজেই যেখানে অর্থের বা ধ্বনির প্রয়োজন বশত সংস্কৃত শব্দই সঙ্গত সেখানে প্রাকৃত বাংলায় তার বাধা নেই। আবার ফার্সি কথাও তার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা একসারে বসিয়ে দিতে পারি। সাধু বাংলায় তার বিঘ্ন আছে—কেননা সেখানে জাতিরক্ষা করাকেই সাধুতারক্ষা করা বলে। প্রাকৃত ভাষার এই ঔদার্য্য গদ্যে পদ্যে আমাদের সাহিত্যের একটি পরম সম্পদ এই কথা মনে রাখ্‌তে হবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ফরমায়েসি-গল্প।

——:*:——

মকদমপুরের জমিদার রায় মহাশয় সন্ধ্যা-আহ্নিক করে', সিকি ভরি অহিফেন সেবন করে', যখন বৈঠকখানায় এসে বসলেন, তখন রাত এক প্রহর। তিনি মসনদের উপর তাকিয়া হেলান দিয়ে বসে' গুড়গুড়ির নল মুখে দিয়ে ঝিমতে লাগলেন। সভাস্থ ইয়ার-বক্সির দল সব চুপ করে রইল; পাছে হুজুরের ঝিমুনির ব্যাঘাত হয়, এই ভয়ে কেউ টুঁ-শব্দও করলে না। খানিকক্ষণ বাদে রায় মহাশয় হঠাৎ জেগে উঠে গা-ঝাড়া দিয়ে বসে প্রথম কথা বললেন—"ঘোষাল! গল্প বল"।

রায় মহাশয়ের মুখ থেকে এ কথা পড়তে না পড়তে তাঁর ডান-ধার থেকে একটি গৌরবর্ণ ছিপছিপে টেড়িকাটা যুবক, হাসি-মুখে চাঁচা গলায় উত্তর করলে—

যে-আজ্ঞে হুজুর, বলছি।

—আজ কিসের গল্প বলবি বল্ ত?

—বর্ষার গল্প হুজুর।

—একে শ্রাবণ মাস, তায় আবার তেমনি মেঘ করেছে, তাই আজ ঘোষাল বর্ষার গল্প বলবে। ওর রসবোধটা খুব আছে। কি বলেন—পণ্ডিত মহাশয়?

একটি অস্থি-চর্ম্মসার দীর্ঘাকৃতি পুরুষ একটিপ নস্য নিয়ে সানুনাসিক স্বরে উত্তর করলেন—

—তার আর সন্দেহ কি? তা না হলে কি মহাশয়ের মত গুণগ্রাহী লোক আর ওকে মাইনে করে চাকর রাখেন? তবে জিজ্ঞাস্য হচ্ছে এই যে, ঘোষাল আজ কি রসের অবতারণা করবে?

ঘোষাল তিলমাত্র দ্বিধা না করে বললে—

—মধুর রসের। বর্ষার রাত্তিরে আর কি রস ফোটানো যায়?

রায় মহাশয় জিজ্ঞাসা করলেন "কেন ভূতের গল্প চলবে না? কি বলেন স্মৃতিরত্ন?"

—আজ্ঞে চলবে না কেন, তবে তেমন জমবে না। ভয়ানক রসের অবতারণা শীতের রাত্রেই প্রশস্ত।

ঘোষাল পণ্ডিত মহাশয়ের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে উঠল—

—এ লাখ কথার এক কথা। কেননা মানুষের বাইরেটা যখন শীতে কাঁপছে, তখনি তার ভিতরটা ভয়ে কাঁপানো সঙ্গত। এই দুই কাপুনিতে মিলে গেলে, গল্পের আর রসভঙ্গ হয় না।

পণ্ডিত মহাশয় এ কথা শুনে মহা-খুসি হয়ে বল্লেন—

—তা ত বটেই, তা ত বটেই! আর তা ছাড়া মধুর রসের মধ্যেই ত ভয়ানক প্রভৃতি সকল রসই বর্ত্তমান, তাতেই না অলঙ্কার শাস্ত্রে ওর নাম—আদিরস।

রায় মহাশয়ের মুখ দিয়ে এতক্ষণ শুধু অম্বরি তামাকের ধোঁয়ার একটি ক্ষীণ ধারা বেরচ্ছিল—এইবার আবার কথা বেরল—কিন্তু তার ধারা ক্ষীণ নয়—

—আপনার অলঙ্কার শাস্ত্রে যা বলে বলুক, তাতে কিছু যায় আসে না। আমার কথা হচ্ছে এই, আমি এখন বুড়ো হতে চল্লুম—বয়েস প্রায় পঞ্চাশ হ'ল। এ বয়েসে প্রেমের কথা কি আর ভাল লাগ্‌বে? ও সব গল্প যাও ছেলে-ছোকরাদের শোনাও গিয়ে।

উপস্থিত সকলেই জানতেন যে রায় মহাশয় তাঁর বয়েস থেকে তাঁর তৃতীয় পক্ষের সহধর্ম্মিণীর বয়েস—অর্থাৎ ঝাড়া পোনেরো বৎসর চুরি করেছেন, অতএব তাঁর কথার আর কেউ প্রতিবাদ কর্‌লেন না। শুধু ঘোষাল বল্‌লে—

—হুজুর, ছেলে-ছোকরারা নিজেরা প্রেম কর্‌তে এত ব্যস্ত যে প্রেমের গল্প শোনার তাদের ফুরসৎ নেই। তা ছাড়া আদিরসের কথা শোনায় ছেলেদের নীতি খারাপ হয়ে যেতে পারে—হুজুরের ত আর সে ভয় নেই!

—দেখেছেন পণ্ডিত মশায়, ঘোষাল কেমন হিসেবি লোক! যাই বলুন, কার কাছে কোন কথা বল্‌তে হয়, তা ও জানে।

—সে কথা আর বল্‌তে? শাস্ত্রে বলে যৌবনে যার মনে বৈরাগ্য আসে সেই যথার্থই বিরক্ত, আর বৃদ্ধ বয়সেও যার মনে রস থাকে সেই যথার্থ রসিক। ঘোষাল কি আর না বুঝে সুঝে কথা কয়? ও জানে আপনার প্রাণে এ বয়েসেও যে রস আছে, এ কালের যুবোদের মধ্যে হাজারে এক জনেরও তা নেই।

—ঠিক বলেছেন পণ্ডিত মশায়। আমি সেদিন যখন সেই ভৈরবীর টপ্পাটা গাইলুম, হুজুর শুনে কত বাহবা দিলেন; আর সেই গানটাই একটা পয়লা-নম্বরের M. A.-এর কাছে গাওয়াতে সে ভদ্রলোক কানে হাত দিলে। বল্‌লে অশ্লীল।

—কোন গানটা রে ঘোষাল?

—"গোরী তুনে নয়না লাগাওয়ে যাদুডারা—"

—কি বলছিস ঘোষাল, ঐ গান শুনে ইস্টুপিট্ কানে হাত দিলে? অমন কান মলে দিতে পার্‌লি নে? হতভাগাদের যেমন ধর্ম্মজ্ঞান তেমনি রসজ্ঞান। ইংরেজি পড়ে জাতটে একেবারে অধঃপাতে গেল!

এই কথা শুনে সে সভার সব চাইতে হৃষ্টপুষ্ট ও খর্ব্বাকৃতি ব্যক্তিটি অতি মিহি অথচ তীব্র গলায় এই মত প্রকাশ কর্‌লেন যে—

—অধঃপাতে গিয়েছিল বটে, কিন্তু এখন আবার উঠছে।

—তুমি আবার কি তত্ত্ব বার কর্‌লে হে উজ্জ্বল নীলমণি?—

রায় মহাশয় যাঁকে সম্বোধন করে এ প্রশ্ন কর্‌লেন, তাঁর নাম নীলমণি গোস্বামী। ঘোষাল তার পিছন থেকে গোস্বামীটি কেটে দিয়ে সুমুখে "উজ্জ্বল" শব্দটি জুড়ে দিয়েছিল। তার এক কারণ, গোস্বামী মহাশয়ের বর্ণ ছিল, উজ্জ্বল নয় ঘোরশ্যাম; আর এক কারণ, তিনি কথায় কথায় উজ্জ্বল-নীলমণির দোহাই দিতেন। এই নাম করণের পর সে রোগ তাঁর সেরে গিয়েছিল।

জমিদার মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে গোঁসাইজি বল্‌লেন—

—আজ্ঞে, ইংরাজিনবীশদের যে মতিগতি ফির্‌ছে তা আমি জেনে শুনেই বল্‌ছি। আমারই জনকত পাসকরা শিষ্য আছে, যাদের কাছে ঘোষাল যদি ও গানটা না গেয়ে, গান ধরত

গেলি কামিনী গজবরগামিনী
বিহসি পালটি নেহারি

তাহলে আমি হলপ করে বল্‌তে পারি তারা ভাবে একেবারে বিভোর হয়ে যেত।

—ও দুয়ের তফাৎটা কোথায় ?

—তফাৎটা কোথায় ? বল্‌লেন ভাল পণ্ডিত মশায় ! একটা টপ্পা আর একটা কীর্ত্তন !

—অর্থাৎ তফাৎ যা তা নামে !

—অবাক করলেন ! তাহলে শোরীমিয়ার সঙ্গে বিদ্যাপতি ঠাকুরের প্রভেদও শুধু নামে। নামের ভেদেই ত বস্তুর ভেদ হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আসল প্রভেদ রসে। যাক্ আপনার সঙ্গে রসের বিচার করা বৃথা। রসজ্ঞান ত আর টোলে জন্মায় না।

—বটে ! অমরু শতক থেকে সুরু করে নৈষধের অষ্টাদশ সর্গ পর্য্যন্ত আলোচনা করে যদি রসজ্ঞান না জন্মায়—তাহলে মনু থেকে সুরু করে রঘুনন্দনের অষ্টাদশ তত্ত্ব পর্য্যন্ত আলোচনা করেও ধর্ম্মজ্ঞান জন্মায় না।

—রাগ কর্‌বেন না পণ্ডিত মশায়, কিন্তু কথাটা এই যে, সংস্কৃত-কাব্যের রস আর পদাবলীর রস এক বস্তু নয়—ও দুয়ের আকাশ পাতাল প্রভেদ।

—আপনি ত দেখ্‌ছি এক কথারই বার বার পুনরুক্তি কর্‌ছেন। মানলুম টপ্পা ও কীর্ত্তন এক বস্তু নয়—কাব্যরস ও পদাবলীর রস এক বস্তু নয়। কিন্তু পার্থক্য যে কোথায়, তা ত আপনি দেখিয়ে দিতে পারছেন না।

—তফাৎ আছে বৈকি। যেমন তালের রস ও তাড়ি একবস্তু নয়—

একটায় নেশা হয়, আর একটায় হয় না। সংস্কৃত কবিতা পড়ে কেউ কখন ধূলোয় গড়াগড়ি দেয় ?

ঘোষালের এ মন্তব্য শুনে মায় স্মৃতিরত্ন সভাসুদ্ধ লোক হেসে উঠল। উজ্জ্বল নীলমণি মহাক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—

—পণ্ডিত মহাশয়, আপনিও এই সব ইয়ারকির প্রশ্রয় দেন—আশ্চর্য্য ! যেমন ঘোষালের বিদ্যে তেমনি তার বুদ্ধি।

রায় মহাশয় ঘোষালকে চব্বিশঘণ্টা ধমকের উপরেই রাখতেন ; কিন্তু তার বিরুদ্ধে অপর কাউকেও একটি কথা বল্‌তে দিতেন না। "আমার পাঁঠা আমি লেজের দিকে কাট্‌ব, কিন্তু অপর কাউকে মুড়ির দিকেও কাট্‌তে দেব না"—এই ছিল তাঁর motto. তিনি তাই একটু গরম হয়ে বল্‌লেন—

— কেন, ওর বুদ্ধির কমতিটে দেখলে কোথায় হে উজ্জ্বল নীলমণি ! তোমাদের মত ওর পেটে বিদ্যে না থাক্‌তে পারে, কিন্তু মগজে ঢের বেশি বুদ্ধি আছে। তাগমাফিক অমনি একটি যুতসই উপমা লাগাও দেখি !

—আজ্ঞে, ওর বুদ্ধি থাক্‌তে পারে—কিন্তু রসজ্ঞান নেই।

—রসজ্ঞান ওর নেই, আর তোমার আছে ? করো ত অমনি একটা রসিকতা !

—আজ্ঞে ঐ রসিকতাই প্রমাণ, ওর মনে ভক্তির নামগন্ধও নেই। যার ধর্ম্মজ্ঞান নেই, তার আবার রসজ্ঞান !

স্মৃতিরত্ন এ কথা শুনে আর চুপ থাক্‌তে পারলেন না। বল্লেন—

—এ আবার কি অদ্ভুত কথা ? ঘোষালের ধর্ম্মজ্ঞান না থাক্‌তে পারে, তাই বলে কি ওর রসজ্ঞান থাক্‌তে নেই ?

—অবশ্য না! ও দুইত আর পৃথক জ্ঞান নয়।

—আমাদের কাছে যা সামান্য, আপনার কাছে যখন তা বিশেষ, আমাদের কাছে যা বিশেষ আপনার কাছে তা অবশ্য সামান্য; এ এক নব্যন্যায় বটে।

—শুনুন পণ্ডিত মশায়! যার নাম রসজ্ঞান তারি নাম ধর্ম্মজ্ঞান, আর যার নাম ধর্ম্মজ্ঞান তারি নাম রসজ্ঞান। নামের প্রভেদে ত আর বস্তুর প্রভেদ হয় না।

—বলেন কি গোঁসাইজি! তাহলে আপনাদের মতে, যার নাম কাম তারি নাম ধর্ম্ম, আর যার নাম অর্থ তারি নাম মোক্ষ?

—আসলে ও সবই এক। রূপান্তরে শুধু নামান্তর হয়েছে।

—বুঝছেন না পণ্ডিত মশায়, কথা খুব সোজা। গোঁসাইজি বলছেন কি যে, যার নাম ভাজা চাল তারি নাম মুড়ি—নামান্তরে শুধু রূপান্তর হয়েছে।

মদের পিঠ পিঠ এই চাটের উপমা আসায়, রায় মহাশয়ের পাত্র-মিত্রগণ মহা খুসি হয়ে অট্টহাস্যে ঘোষালের এ টিপ্পনির অনুমোদন করলেন। উজ্জ্বল নীলমণি এর প্রতিবাদ করতে উদ্যত হবামাত্র, তাঁর মাথার উপর থেকে একটা টিকটিকি বলে উঠল "ঠিক ঠিক ঠিক"। সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের প্রস্ফুরিত ও বিস্ফারিত নাসিকারন্ধ্র হতে একটা প্রচণ্ড সহাস্য হেঁচ্চধ্বনি নির্গত হয়ে, উজ্জ্বল নীলমণির বক্ষদেশ যুগপৎ হাস্য ও নস্যরসে সিক্ত করে দিলে। তিনি অমনি "রাধামাধব" বলে সরে বসলেন। রায় মহাশয় এই সব ব্যাপার দেখে শুনে ভারি চটে বললেন—

—তোমরা কটায় মিলে ভারি গণ্ডগোল বাধালে ত হে! আমি শুনতে চাইলুম গল্প আর এঁরা সুরু করে দিলেন তর্ক—আর সে তর্কের যদি কোনও মাথামুণ্ডু থাকে। ঘোষাল! গল্প বল।

—হুজুর, এই বল্লুম বলে।

—শীগ্‌গির, নইলে এরা আবার তর্ক জুড়ে দেবে। একি আমার শ্রাদ্ধের সভা যে, নাগাড় পণ্ডিতের বিচার চল্‌বে?

উজ্জ্বল নীলমণি বল্‌লেন—

—আজ্ঞে, সে ভয় নেই। যে সভায় ঘোষাল বক্তা, সে সভায় যদি আমি আর মুখ খুলি ত আমার নামই নয়—

"ভদ্রং কৃতং কৃতং মৌনং কোকিলঃ জলদাগমে।"

—পণ্ডিত মশায়ের বচনটি খাপে খাপে মিলে গিয়েছে। কাল যে বর্ষা, তা ত সকলেই জানেন। তার উপর গোঁসাইজির কোকিলের সঙ্গে যে এক বিষয়ে সাদৃশ্য, আছে সে ত প্রত্যক্ষ।

উজ্জ্বল নীলমণির গায়ে এই কথার নখ বসিয়ে দিয়ে ঘোষাল আরম্ভ করলে—

—তবে বলি শ্রবণ করুন।

—দেখ্ মধুর রসের বলে গল্প যেন একদম চিনির পানা করে তুলিস্ নে। একটু নুনঝাল যেন থাকে।

—হুজুর যে অরুচিতে ভুগছেন, তাকি আর জানিনে?

—আর দেখ্, একটু অলঙ্কার দিয়ে বলিস্—একেবারে যেন সাদা না হয়।

—অলঙ্কারের সখই যে আজকাল হুজুরের প্রধান সখ, তা ত আর কারও জানতে বাকী নেই।

—কিন্তু সে অলঙ্কার যেন ধারকরা কিম্বা চুরিকরা না হয়।

—হুজুর, ভয় নেই। পরের সোনা এখানে কানে দেব না, তাহলে গোঁসাইজি তা হেঁচকাটানে কেড়ে নেবেন। কিন্তু এক্ষেত্রে নিজের জিনিস ব্যবহার কর্‌লে সবাই সোনাকে বল্‌বে পিতল, আর বড় অনুগ্রহ করে ত—গিল্টি।

—অন্যে যে যা বলে তা বলুক—কিন্তু আসল ও নকলের প্রভেদ আমার চোখে ঠিক ধরা পড়্‌বে।

—হুজুর জহুরি, সেই ত ভরসা। তবে শুনুন—

শ্রাবণমাস, অমাবস্যার রাত্তির, তার উপর আবার তেমনি দুর্য্যোগ। চারদিক একেবারে অন্ধকারে ঠাসা। আকাশে যেন দেবতারা আবলুশ কাঠের কপাট ভেজিয়ে দিয়েছে;—আর তার ভিতর দিয়ে যা গলে পড়্‌ছে তা জল নয়,—একদম আলকাতরা। আর তার এক একটা ফোঁটা কি মোটা, যেন তামাকের গুল—

—কাঠের কপাটের ভিতর দিয়ে জল কি করে গলে পড়্‌বে বলত মূর্খ? যখন বর্ণনা সুরু করে দিস, তখন আর তোর সম্ভব অসম্ভবের জ্ঞান থাকে না। বল্ জল চুঁইয়ে পড়্‌ছে!

—হুজুর বল্‌তে চান আমি বস্তুতন্ত্রতার ধার ধারি নে। আজ্ঞে তা নয়, আমি ঠিকই বলেছি। জল গলেই পড়্‌ছে, চুঁইয়ে নয়। কপাট বটে, কিন্তু—ফারফোরের কাজ, ভাষায় যাকে বলে জালির কাজ। সেই জালির ফুটো দিয়ে—

—দেখলেন স্মৃতিরত্ন, ঘোষালের ঠিকে ভুল হয় না।

এই শুনে দেওয়ানজি বল্‌লেন—

—দেখলে ঘোষাল! ঠিকে ভুল কর্ত্তার চোখ এড়িয়ে যায় না।

—সে আর বল্‌তে। হুজুর হিসেব নিকেশে যদি অত পাকা না হতেন তা হলে তার বাড়িতে আর পাকা চণ্ডীমণ্ডপ হয়, আগে যার চালে খড় ছিল না।

—তুমি কার কথা বল্‌ছ হে,—আমার?

—যে নল চালায় সে কি জানে কার ঘরে গিয়ে সে নল ঢুক্‌বে? যাক্ ও সব কথা, এখন গল্প শুনুন।

এই দুর্য্যোগের সময় একটি ব্রাহ্মণের ছেলে, বয়েস আন্দাজ পঁচিশ ছাব্বিশ, এক তেপান্তর মাঠের ভিতর এক বটগাছের তলায় একা দাঁড়িয়ে ঠায় ভিজছিল।

—কি বল্লি! ব্রাহ্মণের ছেলে রাত দুপুরে গাছতলায় দাঁড়িয়ে ভিজছে আর তুই ঘরের ভিতর বসে মনের সুখে গল্প বলে যাচ্ছিস? ও হবে না ঘোষাল, ওকে ওখান থেকে উদ্ধার কর্‌তে হবে!

—হুজুর, অধৈর্য্য হবেন না; উদ্ধার ত করবই। নইলে মধুর রসের গল্প হবে কি করে? কেউ ত আর নিজের সঙ্গে নিজে প্রেম কর্‌তে পারে না।

—তা ত জানি, কিন্তু তুই হয়ত এখানেই আর একটাকে এনে জোটাবি! গল্প সুরু করে দিলে তোর ত আর কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না।

—দেখুন রায় মহাশয়, ঘোষাল যদি তা করে, তাতেও অলঙ্কার শাস্ত্রের হিসেবে কোনও দোষ হয় না। সংস্কৃত কবিরাও ত অভিসারিকাদের এমনি দুর্য্যোগের মধ্যেই বার কর্‌তেন।

—দেখুন পণ্ডিত মহাশয়, সেকালে তাদের হাড় মজবুত ছিল,

একালের ছেলেমেয়েদের আধঘণ্টা জলে ভিজলে নির্ঘাৎ pneumonia হবে। এ যে বাঙ্গলাদেশ, তায় আবার কলিকাল!

এ কথা শুনে উজ্জ্বলনীলমণি আর স্থির থাক্‌তে পারলেন না, সবেগে বলে উঠলেন—

—তাতে কিছু যায় আসে না মশায়। পদাবলী পড়ে দেখ্‌বেন,—কি ঝড়জলের মধ্যে অভিসারিকারা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়্‌তেন, এবং তাতে করে তাঁদের কারও যে কখনো অপমৃত্যু ঘটেছে, এ কথা কোনও পদাবলীতে বলে না। আসল কথাটা কি জানেন, মনের ভিতর যার আগুন জ্বলছে, বাইরের জলে তার কি কর্‌বে?

—হুজুর ত ঠিকই ভয় পেয়েছেন। অভিসারিকাদের চামড়া মোম-জামা হতে পারে, কিন্তু তাই বলে ব্রাহ্মণসন্তানকে জলে ভেজালে যে ব্রহ্মহত্যা হবে না, কে বল্‌তে পারে? অভিসারক বলে ত আর কোনও জানোয়ার নেই। দেখুন হুজুর, ব্রাহ্মণের ছেলে ভিজছিল বটে, কিন্তু তার গায়ে জল লাগছিল না। তার মাথায় ছিল ছাতা, গায়ে বর্ষাতি, আর পায়ে বুট জুতো। তার পর শুনুন—

শুধু ঝড়জল নয়। মাথার উপর বজ্র ধমকাচ্ছিল আর চোখের সুমুখে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। সে এক তুমুল ব্যাপার। লাখে লাখে তুবড়ি ছুটছে, ঝাঁকে ঝাঁকে হাউই উড়ছে, তারি ফাঁকে ফাঁকে বোমা ফুটছে—সেদিন স্বর্গে হচ্ছিল দেওয়ালি।

—কি বল্‌লি ঘোষাল, শ্রাবণ মাসে দেওয়ালি,—তুই দেখছি পাঁজি মানিস নে!

—আজ্ঞে আমি মানি, কিন্তু দেবতারা মানেন না। স্বর্গেত সমস্ত-ক্ষণই শুভক্ষণ। কি বলেন পণ্ডিত মশায়?

—তা ত ঠিকই—আমাদের পক্ষে যা নৈমিত্তিক দেবতাদের পক্ষে তা কাম্য। সুতরাং তাঁরা যখন যা খুসি তখনই সেই উৎসব কর্‌তে পারেন।

—শুধু কর্‌তে পারেন না, করেও থাকেন। স্বর্গে ত আর উপবাস নেই, আছে শুধু উৎসব। স্বর্গে যদি একাদশী থাক্‌ত তাহলে কে আর সেখানে যেতে চাইত? আমি ত নয়ই—

—উনি ত ননই! যেন উনি যেতে চাইলেই স্বর্গে যেতে পেতেন।

—হুজুর আমি কোথাও যেতে চাইনে—যেখানে আছি সেইখানেই থাক্‌তে চাই।

—যেখানে আছেন সেইখানেই থাক্‌তে চান! যেন উনি থাক্‌তে চাইলেই থাক্‌তে পেলেন। তুই বেটা ঠিক নরকে যাবি!

—হুজুর যেখানে যাবেন আমি সঙ্গে সঙ্গে যাব!

—দেখছেন পণ্ডিত মশায়, ঘোষালের আর যাই দোষ থাক্, লোকটা অনুগত বটে। যাক্ ও সব বাজে কথা, যার কপালে যা আছে তাই হবে—তুই এখন বল্ তারপর কি হ'ল?

তার পর দেবতারা একটা বিদ্যুতের ছুঁচোবাজি ছেড়ে দিলেন। সেটা ঐ কপাটের ফাঁক দিয়ে গলে এসে অন্ধকারের বুকচিরে ব্রাহ্মণের ছেলের চোখের সুমুখ দিয়ে লাউডগা সাপের মত এঁকে বেঁকে গিয়ে সামনে পড়্‌ল। তার আলোতে দেখা গেল যে দশহাত দূরে একটা পর্ব্বতপ্রমাণ মন্দির খাড়া রয়েছে। ব্রাহ্মণের ছেলে অমনি "ব্যোমভোলানাথ!" বলে হুঙ্কার দিয়ে ছুটে গিয়ে সেই মন্দিরের দুয়োরে ধাক্কা মারতে লাগল। একটু পরে ভিতর থেকে কে একজন হুড়্‌কো খুলে দিলে। তারপর ব্রাহ্মণ সন্তান ঢোকবার আগেই ঝড় জল হো হা করে মন্দিরের ভিতর গিয়ে পড়্‌ল আর অমনি বাতি গেল নিবে। এই অন্ধকারের মধ্যে ব্রাহ্মণের ছেলেটি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

—মন্দিরে ঢুকে ভ্যাবা গঙ্গারামের মত দাঁড়িয়ে রইল? আর পায়ের জুতো খুললে না—আচ্ছা ব্রাহ্মণের ছেলে ত!

—হুজুর, সে জুতোয় কিছু দোষ নেই,—রবারের।

—এই যে বল্‌লি বুট?

—বুট বটে, কিন্তু রবারের বুট। হুজুর আমার গল্পের নায়ক কি এতই বোকা যে মন্দির অশুদ্ধ করে দেবে?

তারপর অনেক ডাকাডাকিতে কেউ জবাব না করায় সে ভদ্রলোক অগত্যা হাতড়ে হাতড়ে কপাটের হুড়কো বন্ধ করে দিলে। তারপর পকেট থেকে দিয়াশিলাই বার করে জ্বালিয়ে দেখলে যে বাঁ-দিকে একটা হারিকেন লণ্ঠন কাৎ হয়ে পড়ে রয়েছে। অনেক কষ্টে সেই লণ্ঠনটি জেলে সে দেখ্‌তে পেলে—ডান-দিকে দেয়ালের গায়ে—খাড়া রয়েছে চিত্রপুত্তলিকার মত—একটি মূর্ত্তি। আর সে কি মূর্ত্তি! একেবারে মারবেল পাথরে খোদা। ব্রাহ্মণ সন্তান একদৃষ্টে সেই মূর্ত্তির দিকে চেয়ে রইল। সে দেখবার মত জিনিসও বটে। নাকটি তিলফুলের মত, চোখ দুটি পদ্মফুলের মত, গাল দুটি গোলাপফুলের মত, ঠোঁট দুটি ডালিম ফুলের মত, কাণ দুটি—

—রাখ্ তোর রূপবর্ণনা। লোকটা দেখ্‌ছি অতি হতভাগা। দেবতার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল, প্রণাম কর্‌লে না!

—আজ্ঞে তার দোষ নেই। মূর্ত্তিটি যে কোন্ দেবতার তা সে ঠাওর কর্‌তে পারছিল না। কালী, শীতলা, মনসা, চণ্ডী প্রভৃতি কোনও জানাশুনো দেবতা ত নয়।

—তা নাই হোক্, দেবতা ত বটে। দেবতা ত তেত্রিশ কোটি—মানুষে কি তাদের সবাইকে চেনে? আর চেনে না বলে প্রণাম কর্‌বে না?

—আজ্ঞে লোকটা সন্ন্যাসী। ওদের ত কোন ঠাকুরদেবতাকে প্রণাম কর্‌তে নেই—ওরা যে সব স্বয়ংব্রহ্ম।

—দেখ্ ঘোষাল, মিথ্যে কথা তোর মুখে আর বাধে না দেখ্‌ছি। এই মাত্র বলেছিস ব্রাহ্মণের ছেলে।

—আজ্ঞে মিথ্যে কথা নয়, তার গলা-ওঁটানো কোটের ভিতর দিয়ে পৈতা দেখা যাচ্ছিল।

—আবার বলছিস্ সন্ন্যাসী! দেখ্ যে, কখনো সাধুসন্ন্যাসী দেখে নি তার কাছে গিয়ে এই সব ফক্কুড়ি কর্। পরমহংস বলো, অবধূত বলো, নাগা বলো, আকালি বলো, গিরি বলো, পুরি বলো, ভারতী বলো, বাবাজি বলো, আর কত নাম করব—রামায়েৎ লিঙ্গায়েৎ কাণফাটা ঊর্দ্ধবাহু, দাদুপন্থী অঘোরপন্থী,—দেশে এমন সাধুসন্ন্যাসী নেই যে আমার পয়সা খায় নি, আর যার ওষুধ আমি খাই নি। কিন্তু কারও ত কখন পৈতা দেখি নি—এক দণ্ডী ছাড়া। তাদেরও ত বাবা পৈতা গলায় ঝোলানো থাকে না, দণ্ডে জড়ানো থাকে।

—হুজুর এ, ছোকরা ও সব দলের নয়। এ হচ্ছে একজন স্বদেশী সন্ন্যাসী।

—সন্ন্যাসী ত বিদেশীই হয়ে থাকে। তুই আবার স্বদেশী সন্ন্যাসী কোত্থেকে বার করলি? জানিসনে, গেঁয়ো যোগী ভিখ্ পায় না।

—হুজুর আমি বার করি নি, এরা নিজেই বেরিয়েছে। এরা ভিখ চায়ও না, নেয়ও না। এদের পয়সার অভাব নেই। এরা আপনার ছাইমাখা কোপনি-আঁটা টোঁ টোঁ কোম্পানীর দল নয়। এরা দীক্ষিত নয়—শিক্ষিত সন্ন্যাসী। এরা গেরুয়াও পরে, জুতো মোজাও পরে,

স্বামীও হয়, পৈতাও রাখে। এরা একসঙ্গে ভবঘুরে ও সহুরে, এক রকম গেরস্ত সন্ন্যাসী।

—এরা কিছু মানে টানে?

—আজ্ঞে এরা কিছুই মানে না, অথচ সবই মানে।

—কথাটা ভাল বুঝলুম না।

—বোঝা বড় শক্ত হুজুর। এরা হচ্ছে সব বৈদান্তিক শাক্ত।

—বৈদান্তিক শাক্ত আবার কি রে! এ বেখাপ্পা ধর্ম্মমত পয়দা করলে কে?

—হুজুর, জর্ম্মাণরা। যার সঙ্গে যা একদম মেলে না, তার সঙ্গে তা বেমালুম মিলিয়ে দিতে ওদের মত ওস্তাদ দুনিয়ায় আর কে আছে? ওরা যেমন পাটে আর পশমে মিলিয়ে কাশ্মীরী শাল বুনে এদেশে চালান দেয়—তেমনি ওরা শঙ্করের সঙ্গে শঙ্করী মিলিয়ে এদেশে চালান দিয়েছে।

—চোর বেটারা যেন ভেল চালায়, কিন্তু দেশের লোক তা নেয় কেন?

—আজ্ঞে সস্তা বলে।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকা উজ্জ্বলনীলমণির ধাতে ছিল না। তিনি বল্‌লেন—

—ঘোষাল যাদের কথা বল্‌ছে তারা সব প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। আমার পাসকরা শিষ্যেরাই হচ্ছে খাঁটি বৈদান্তিক বৈষ্ণব।

—অর্থাৎ এঁদের কাছে সাকার ও নিরাকারের ভেদ শুধু উপসর্গে; এবং সে ভেদজ্ঞানও এঁদের নেই, এঁরা খুসিমত সা'র জাগায় নি এবং নি'র জায়গায় সা বসিয়ে দেন!

রায় মহাশয়ের আর ধৈর্য্য থাকল না। তিনি বেজায় রেগে উঠে চীৎকার করে বল্‌লেন—

—তোমার টীকা টিপ্পনি রাখো হে ঘোষাল! আমার কাছে ও-সব বুজরুকি চল্‌বে না। ইস্কুলপিটরা দুপাতা ইংরেজি পড়ে সব সোঽহং হয়ে উঠেছে। আমি জানি এরা সব কি—হয় বর্ণচোরা নাস্তিক নয় বর্ণ-চোরা খৃষ্টান। ঐ অকালকুষ্মাণ্ডটা বৈদান্তিক শাক্তই হোক আর বৈদান্তিক বৈষ্ণবই হোক, গেরস্তই হোক আর সন্ন্যাসীই হোক, স্বদেশীই হোক আর বিদেশীই হোক, তোমার ঐ ব্রাহ্মণের ছেলের ঘাড় ধরে ঐ দেবতার পায়ে মাথা ঠেকাও।

—হুজুর, ওকে দিয়ে যদি এখন প্রণাম করাই তাহলে আমার গল্প মারা যায়।

—আর যদি প্রণাম না করে ত কান ধরে মন্দির থেকে বার করে দে।

—হুজুর, তাহলেও আমার গল্প মারা যায়।

—যাক্ মারা। আমি ঐ সব গোঁয়ারগোবিন্দ লোকের যথেচ্ছা-চারের কথা শুন্‌তে চাইনে।

—হুজুর যদি জোর করেন ত আমি নাচার। গল্প তাহলে এই-খানেই বন্ধ করলুম।

—বেশ! এ মাসের মাইনেও তাহলে এইখানেই বন্ধ হল।

এই কথা শুনে ঘোষাল শশব্যস্তে বলে উঠল—

—হুজুর, আপনি মিছে রাগ করছেন। মূর্ত্তিটে যদি দেবী না হয়ে মানবী হয়?

—এ আবার কি আজগুবি কথা বার করলি? এই ছিল দেবতা আর এই হয়ে গেল মানুষ!

—দেবতা যে মানুষ আর মানুষ যে দেবতা হয়, এ ত আর আজ-গুবি কথা নয়। এ কথা ত সকল দেশের সকল শাস্ত্রেই আছে। তবে আমি ত আর পুরাণকার নই। এরকম ওলটপালট আমি করলে কেউ তা মানবে না—আপনিও বলবেন ওর ভিতর বস্তুতন্ত্রতা নেই। ব্যাপারখানা আসলে কি তা বলছি। হুজুর মনোযোগ করবেন। ব্রাহ্মণের ছেলে যখন মন্দিরের দরজা ঠেলছিল তখন ভিতরে যদি জন প্রাণী না থাকত, তাহলে হুড়কো খুলে দিলে কে? আর যখন দেখা গেল যে মন্দিরের মধ্যে অপর কোনও কিছু নেই, তখন আগে যাঁকে প্রতিমা বলে ভুল হয়েছিল, তিনিই যে ও দ্বার মুক্ত করেছিলেন, সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না। সেটি যখন দেখতে দেবীর মত অথচ দেবী নয়—তখন অপ্সরা না হয়ে আর যায় না।

—খুব কথা উল্টে নিতে শিখেছিস্ বটে।

ব্রাহ্মণের ছেলে যখন দেখলে যে সেই মূর্ত্তিটির চোখে পলক পড়ছে, নাকে নিঃশ্বাস পড়ছে, তখন আর তার বুঝতে বাকী থাকল না যে, স্বর্গের কোনও অপ্সরা অভিসারে বেরিয়েছিল, অন্ধকারে পথ ভুলে পৃথিবীতে এসে পড়েছে আর এই ঝড়বৃষ্টির ঠেলায় এই মন্দিরে এসে আশ্রয় নিয়েছে। বেচারা মহা ফাঁপরে পড়ে গেল। দেবী হলে পূজো করতে পারত, মানবী হলে প্রণয় করতে পারত, কিন্তু অপ্সরাকে নিয়ে সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। তার মনের ভিতর এক দিক থেকে ভক্তি আর একদিক থেকে প্রীতি ঠেলে উঠে পরস্পর লড়াই করতে লাগল।

—কি বল্‌লি—ভক্তি ও প্রীতি পরস্পর লড়াই করতে লাগল? ও দুই ত এক সঙ্গেই থাকে।

—ও দুই শুধু একসঙ্গে থাকে না—একই জিনিস। আমাদের মতে ভক্তি পরাপ্রীতি আর প্রীতি অপরা-ভক্তি।

—মাপ করবেন গোঁসাইজি। ভক্তির জন্ম ভয়ে, আর প্রীতির জন্ম ভরসায়। ও দুই একসঙ্গে ঘর করে বটে, কিন্তু সে বোন্ সতীনের মত।

—ব্রাহ্মণের ছেলেকে ওরকম অকস্টবন্ধে ফেলে রাখা ঠিক নয়! অপ্সরাদের প্রতি ভক্তি! রামো, সে ত হবারই জো নেই, তবে প্রণয়ে দোষ কি?

—হুজুর, দোষ কিছু নেই, সম্পর্কে বাধে না। তবে লোকে বলে অপ্সরার সঙ্গে প্রেম করলে মানুষে পাগল হয়।

—আরে তাতে কি গেল এল? যার সঙ্গেই হো'ক না প্রেম করলেই ত মানুষে পাগল হয়।

—কথা ঠিক, কিন্তু সে হচ্ছে একরকম সৌখীন পাগলামি। স্ত্রী-লোকের সঙ্গে ভালবাসায় পড়লে লোকে মাথায় মধ্যম-নারায়ণ মাখে না, মাখে কুন্তলবৃষ্য। আর আপ্সরার টানে মানুষ হয় উন্মাদ পাগল। তখন স্বর্গে না গেলে আর মানুষের নিস্তার নেই—অথচ সেখানে প্রবেশ নিষেধ। কি বলেন পণ্ডিত মশায়?

—প্রমাণ ত হাতেই রয়েছে,—বিক্রমোর্ব্বশী।

—শুনলেন হুজুর, পণ্ডিত মশায় কি বললেন? এ অবস্থায় ও ব্রাহ্মণ সন্তানটিকে কি করে ভালবাসায় ফেলি?

—তাহলে কি গল্প এইখানেই বন্ধ হ'ল?

—আজ্ঞে তাও কি হয়? যা হল তা শুনুন—

ব্রাহ্মণের ছেলেকে অমন উসখুস করতে দেখে, সেই মূর্ত্তিটিও একটু ভীত ত্রস্ত হয়ে উঠল, অমনি তার কাঁধ থেকে অঞ্চল পড়ল খসে। ব্রাহ্মণের ছেলে দেখতে পেলে তার কাঁধে ডানা নেই, ব্যাপারটা যে কি তখন আর তার বুঝতে বাকি থাকল না। এখন বুঝছেন হুজুর, ওকে দিয়ে প্রণাম করালে কি অনর্থটাই ঘটত? একে তরুণ বয়েস, তাতে আবার হাতের গোড়ায়, পড়ে-পাওয়া ডানাকাটা পরি! তার উপর আবার এই দুর্য্যোগের সুযোগ। এ অবস্থায় পঞ্চতপা ঋষিদেরই মাথার ঠিক থাকে না—ব্রাহ্মণের ছেলে ত মাত্র বালা-যোগী। পরস্পর পরস্পরের দিকে চাইতে লাগল—ব্রাহ্মণ যুবক সিধে ভাবে, আর যুবতীটি আড়ভাবে। চার চক্ষুর মিলন হবামাত্র সেই সুন্দরীর নয়ন-কোণ থেকে একটি উল্কাকণা খসে এসে ব্রাহ্মণের ছেলের চোখের ভিতর দিয়ে তার মরমে গিয়ে প্রবেশ করলে। ব্রাহ্মণের ছেলের বুক বিলেতি বেদান্ত পড়ে পড়ে শুকিয়ে একেবারে সোলার মত চিমসে ও খড়খড়ে হয়ে গিয়েছিল—কাজেই সেই সুন্দরীর চোখের চকমকি-ঠোকা আগুনের ফুলকিটি সেখানে পড়বা মাত্র সে বুকে আগুন জ্বলে উঠল। আর তার ফলে, তার বুকের ভিতর যে ধাতু ছিল সে সব গলে একাকার হয়ে উথলে উঠতে লাগল আর অমনি তার অন্তরে ভূমিকম্প হতে সুরু হল। তার মনে হ'ল যেন তার পাঁজরা সব ধসে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে তার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করে কাঁপতে লাগল, মুখের ভিতর কথা জড়িয়ে যেতে লাগল, মাথা দিয়ে ঘাম পড়তে লাগল। এক কথায় ম্যালেরিয়া-জ্বর আসবার সময় মানুষের যে অবস্থা হয় তার ঠিক সেই অবস্থা হ'ল। ব্রাহ্মণের ছেলে বুঝলে তার বুকের ভিতর ভালবাসা জন্মাচ্ছে।

এই বর্ণনা শুনে উজ্জ্বল নীলমণি অত্যন্ত ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে বলে উঠলেন—

—আহা! পূর্ব্বরাগের কি চমৎকার বর্ণনাই হ'ল। রসশাস্ত্রে যাকে

বলে সাত্ত্বিক ভাব তার উপমা হ'ল কি না ম্যালেরিয়া-জ্বর। ঘোষাল যখন মধুর রসের কথা পেড়েছিল, তখনই জানি ও শেষটা বীভৎস রস এনে ফেলবে। আর লোকে বলবে ঘোষাল কি রসিক।

ঘোষাল এ সব কথার কোন উত্তর না করে স্মৃতিরত্নের দিকে চাইলে। সে চাউনির অর্থ—মশায় জবাব দিন। স্মৃতিরত্ন বল্‌লেন—

—ত্রিগুণের সাম্যাবস্থাতেই ত চিত্ত প্রকৃতিস্থ থাকে। আর তুমি যাকে সাত্ত্বিকভাব বলছ সেও ত একটা চিত্তবিকার ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং ও মনোভাবকে মনের জ্বর বলায় ঘোষাল কি অন্যায় কথা বলেছে?

—পণ্ডিত মশায়, শুধু তাই নয়। ম্যালেরিয়ার সঙ্গে ও জিনিসের আরও অনেক মিল আছে। দুয়ের চিকিৎসাও এক, মধুর রসেরও ওষুধ তিক্তরস। তত্ত্বকথার কুইনিন্ খাওয়ালে ভালবাসা মানুষের মন থেকে পালাতে পথ পায় না।—

দেওয়ানজি এ কথার প্রতিবাদ করে বল্‌লেন—কুইনিনে বুঝি জ্বর ছাড়ে? শুধু আট্‌কে দেয়। শিশি শিশি কুইনিন্ গিলেছি কিন্তু আমার পিলে—

রায় মহাশয় এতক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে কি ভাবছিলেন। উজ্জ্বল-নীলমণি ও স্মৃতিরত্নের কথায় তিনি কাণ দেন নি, কিন্তু দেওয়ানজির কথাটি তাঁর কাণে পৌঁছেছিল। তিনি মহা গরম হয়ে বললেন—

—চুপ করো হে দেওয়ানজি, তোমার পিলে কত বড় হয়ে উঠছে, সে কথা শুনে শুনে আমার কাণ পচে গেল। ঘোষালের যে যকৃৎ শুকিয়ে যাচ্ছে, কৈ ও ত তা নিয়ে রাত নেই দিন নেই যার তার কাছে

মাকে কাঁদতে বসে না। পিলে যকৃতের চাইতে যা দশগুণ বেশী সাংঘাতিক, তাই হয়েছে ঐ ব্রাহ্মণের ছেলের,—হৃদরোগ। ও যে কি ভয়ানক রোগ তা আমি ভুগে ভুগে টের পেয়েছি। সে যা হোক, ঘোষাল যে একটা ব্রাহ্মণের ছেলেকে রাতদুপুরে একটা তেপান্তর মাঠের ভিতর একটা মন্দিরের মধ্যে একটা মেয়ের হাতে সঁপে দিলে, অথচ তার কে বাপ্ কে মা, কি জাত কি গোত্র জানা নেই; সে বিষয়ে দেখছি তোমাদের কারও খেয়াল নেই। হ্যা দেখ্ ঘোষাল, তুই ব্রাহ্মণের ছেলের জাত মারবার আচ্ছা ফন্দি বার করেছিস! উজ্জ্বল-নীলমণি যে বলেছিল তোর ধর্ম্মজ্ঞান নেই এখন দেখছি সে কথা ঠিক।

—আজ্ঞে সে কথা আমি অন্য সূত্রে বলেছিলুম। যা ঘটনা হয়েছে তাতে ঘোষালের দোষ নেই। পূর্ব্বরাগ ত আর জাতবিচার করে হয় না। এ বিষয়ে বিদ্যাপতি ঠাকুর বলেছেন "পানি পিয়ে পিছু জাতি বিচারি"—

—বটে! তবে যাও মুসলমানের ঘরে খাও পানি, বদনায় করে। তারপরে এখানে একবার জাতবিচার করতে এসে দেখো কি হয়।

—হুজুর, গোঁসাইজি কথা ঠিকই বলেছেন—শুধু একটা কথায় একটু ভুল করেছেন। "পানি" না বলে ব্রাণ্ডিপানি বল্‌লে আর কোনও গোলই হত না। জল অবশ্য যার তার হাতে খাওয়া যায় না, কিন্তু মদ সকলের হাতেই খাওয়া যায়। আর ভালবাসা জিনিসটে ত দুনিয়ার সেরা মদ।

—তোর দেখছি হতভাগা শুঁড়িখানা ছাড়া আর কোথায়ও উপমা জোটে না। তোরা দুটোয় মিলেছিস্ ভাল। একে মনসা তায় ধূনোর গন্ধ। একে ঘোষাল মূলগায়েন তার উপর আবার উজ্জ্বলনীলমণি

দোহার। এ বিষয়ে পণ্ডিত মশায়ের মত শুন্‌তে চাই—তোদের কথা শুন্‌তে চাই নে।

—অজ্ঞাত-কুলশীলার প্রতি ভালবাসার ঐরূপ আচম্বিতে জন্মলাভটা স্মৃতির হিসেবে নিন্দনীয়, কিন্তু কাব্যের হিসেবে প্রশস্ত। শকুন্তলা, দময়ন্তী, মালবিকা, বাসবদত্তা রত্নাবলী মালতী প্রভৃতি সব নায়িকারই ত—

—তাহলে কি আপনি বল্‌তে চান স্মৃতির ধর্ম্ম এক আর কাব্যের ধর্ম্ম আলাদা?

—আজ্ঞে তা ত হবেই। স্মৃতির কারবার মানুষের জীবন নিয়ে আর কাব্যের কারবার তার মন নিয়ে।

—কাব্যের শিক্ষা আর স্মৃতির শিক্ষা যদি উল্টো হয়, তাহলে মানুষে কোনটা মেনে চল্‌বে?

—দুটোই। কাজকর্ম্মে স্মৃতি আর লেখাপড়ায় কাব্য।

—দেখুন রায় মহাশয়, ঐখানেই ত স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের সঙ্গে আমাদের মতের অমিল। আমরা বলি রস এক—তা সে জীবনেই হোক আর কাব্যেই হোক।

—তাহলে আপনারা কি চান, যে গল্পটা হোক জীবনের মত আর জীবনটা হোক্ গল্পের মত?

—আজ্ঞে তা নয় হুজুর। ভট্টাচার্য্য-মতে, জীবনে ফেন ফেলে দিয়ে ভাত খেতে হয় আর কাব্যে ভাত ফেলে দিয়ে ফেন খেতে হয়; কিন্তু গোস্বামী-মতে কি জীবনে কি কাব্যে একমাত্র গলা ভাতেরই ব্যবস্থা আছে।

—তুমি থামো ঘোষাল, এ সব বিষয়ে বিচার করবার অধিকার তোমার নেই। পরিণামবাদ কাকে বলে যদি বুঝতে.....

—ঘোষাল তা না বুঝতে পারে, কিন্তু অপরিণামবাদ কাকে বলে তা বুঝলে আপনি ও সব বাক্য মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতেন না। অলঙ্কার শাস্ত্র যদি ধর্ম্মশাস্ত্রের সিংহাসন অধিকার করে, তাহলে তার পরিণাম সমাজের পক্ষে কি ভীষণ হয় ভেবে দেখুন ত।

—ঠিক বলেছেন পণ্ডিত মশায়, উনি কাব্যে ও সমাজে ভেস্তে দিতে চান—যে দুয়ের প্রভেদ আকাশপাতাল। সমাজে হয় আগে বিয়ে, পরে সন্তান, তারপরে মৃত্যু; আর কাব্যে হয় আগে ভালবাসা তারপর হয় বিয়ে নয় মৃত্যু। এক কথায় মানুষের জীবনে যা হয় তার নাম প্রাণান্ত। কাব্য কিন্তু হয় মিলনান্ত নয় বিয়োগান্ত; হয় ঘটক নয় ঘাতক হওয়া ছাড়া কবিদের আর উপায় নেই।

—তাহলে তুই দেখ্‌ছি ঐ ব্রাহ্মণের ছেলের হয় জাত মার্‌বি নয় প্রাণ মার্‌বি।

—আজ্ঞে প্রাণে মার্‌তে পারি কিন্তু জাত কিছুতেই মার্‌ব না। হুজুরের কাছে গল্প বলছি, আর আমার নিজের প্রাণের ভয় নেই?

—দেখ তোকে আগেই বলেছি ব্রহ্মহত্যা কিছুতেই হতে দেব না।

—আজ্ঞে যদি আখেরে মাথায় বাজ পড়ে লোকটা মারা যায় সেও কি আমার দোষ?—এ দুর্য্যোগ কি আমি বানিয়েছি?

—কি বল্‌লি? ব্রাহ্মণের অপমৃত্যু, মন্দিরের ভিতরে আর আমার সুমুখে, বেটা আজ গাঁজা টেনে এসেছিস বুঝি! যেমন করে পারিস মিলনান্ত কর্‌তেই হবে—বিয়োগান্ত কিছুতেই হতে দেব না।

—আজ্ঞে আমিও ত সেই চেষ্টায় আছি। তবে ঘটনাচক্রে কি হয়

তা বল্‌তে পারি নে। একটা কথা আপনার পা ছুঁয়ে বল্‌ছি, যেমন করেই হোক আমি ওর জাত আর প্রাণে দুই টিঁকিয়ে রাখব—তারপর যা হয়। হুজুর আমার বেয়াদবি মাপ করবেন, যদি একটু ধৈর্য্য ধরে না থাকেন তাহলে গল্প এগুবে কি করে, আর যদি না এগোয় ত তার অন্তই বা হবে কি করে।

—আচ্ছা বলে যা।

—তবে শুনুন।

ব্রাহ্মণের ছেলে প্রথমটা যতটা হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল, শেষে আর ততটা থাক্‌ল না। সব বিপদের মত ভালবাসার প্রথম ধাক্কাটা সামলানো মুস্কিল, তার পর তা সয়ে আসে। ক্রমে যখন তার জ্ঞানচৈতন্য ফিরে এল, তখন সে সেই মেয়েটিকে ভাল করে খুঁটিয়ে দেখ্‌তে লাগলে। প্রথমেই তার চোখে পড়্‌ল যে মেয়েটির মাথার চুল কপালের উপর চূড়ো করে বাঁধা—আমাদের মেয়েরা নেয়ে উঠে চুল যেমন করে বাঁধে তেমনি করে,—বোধহয় চুল ভিজে গিয়েছিল বলে। তারপর চোখে এসে ঠেকল তার গড়ন। সে অঙ্গসৌষ্ঠবের কথা আর কি বল্‌ব। তার দেহটি ছিল তার চোখের মত লম্বা, তার নাকের মত সোজা আর তার ঠোঁটের মত পাতলা। কিন্তু বেচারি ভিজে একেবারে সপসপে হয়ে গিয়েছিল। তার শাড়ী চুঁইয়ে দরবিগলিত ধারে জল পড়্‌ছিল, মনে হচ্ছিল যেন তার সর্ব্বাঙ্গ রোদন কর্‌ছে। এই দেখে ব্রাহ্মণের ছেলের ভারি মায়া হল, সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের ভিতরও আত্মাপ্রাণী কাঁদতে সুরু করে দিলে।

—"চলে নীলশাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিত মোর।"

—কি? কি? উজ্জ্বল নীলমণি আবার কি বলে?

—হুজুর, গোঁসাইজির ভাব লেগেছে তাই ইনি পদাবলী আওড়াচ্ছেন। উনি বল্‌ছেন—

"চলে নীলশাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিত মোর।"

—ঘোষাল! মেয়েটার পরণে কি রঙের শাড়ী ছিলরে?

—হুজুর, লাল।

—আঃ! ঐ এক কথায় সব মাটি কর্‌লে হে।

"চলে লাল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিত মোর"

বল্‌লে ও কবিতার আর থাকে কি? আর যার তুল্য কবিতা ভু-ভারতে কখন হয়ও নি হবেও না, তারই কি না জান মেরে দিলে?

—গোঁসাইজি গোসা কর্‌ছেন কেন? আমি যে রঙ চড়িয়েছি তাতেই ত উপমা মেলে। মানুষের পরাণ যদি কেউ নিঙড়ায় তা হলে তা থেকে যা বেরবে তার রঙ ত লাল। তবে বল্‌তে পারিনে, হতে পারে যে কারও কারও রক্তের রঙ ও চামড়ার রঙ এক—ঘোর নীল।

—নাই পেয়ে পেয়ে এখন দেখছি তুমি ভদ্রলোকের মাথায় চড়্‌ছ।

—রাগ করেন কেন মশায়। কোনও সাহেবকে যদি বলা যায় যে তোমার গায়ের রক্ত নীল, তাহলে ত সে না চাইতে চাকরি দেয়।

আবার একটা বকাবকির সূত্রপাত দেখে রায় মহাশয় হুঙ্কার ছেড়ে বললেন,—

—যদি কথায় কথায় তর্ক তুলিস তাহলে রাত দুপুরেও গল্প শেষ হবে না—আর তুই ভেবেছিস এইখানেই আজ রাত কাটাব—

—হুজুর, তর্ক আমি করি? আমি একজন গুণী লোক—নভেলিস্ট।

কথায় বলে যাদের আর গুণ নেই তাদের ছার গুণ আছে। যারা গল্প কর্‌তে পারে না তারাই ত তর্ক করে।

—ভারি গুণী! কি চমৎকার গল্পই বল্‌ছেন।

—বটে! আমি এইখান থেকেই ছেড়ে দিচ্ছি, আপনি গোঁসাইজি তারপর চালান দেখি ত কতক্ষণ চালাতে পারেন—হুজুরের এক প্রশ্নের ধাক্কাতেই উল্টে চিৎপাত হয়ে পড়্‌বেন—

—ওরে ঘোষাল, ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছিস। আমার আর একটা প্রশ্ন আছে—মেয়েটার বয়েস কত?

—উনিশ কি বিশ।

—সধবা না বিধবা?

—কুমারী। কাব্যে হুজুর কুমারী ছাড়া আর কিছু ত চলে না।

—আমাকে বোকা পেয়েছিস না খোকা পেয়েছিস্? ছ-ছেলের মা'র বয়েসী, আর তিনি হলেন কুমারী! বাঙ্গালীর ঘরে কোথায় এত বড় আইবুড়ো মেয়ে দেখেছিস বল ত?

—হুজুর, মেয়েটি ত বাঙ্গালী নয়—হিন্দুস্থানী।

—যেই একটা মিথ্যে কথা ধরা পড়েছে অমনি আর একটা মিথ্যে কথা বানাচ্ছিস। কোথাও কিছু নেই—বলে দিলি হিন্দুস্থানী!

—হুজুর, তার গায়ে ঝুলছিল সলমাচুমকির কাজ করা ওড়না, আর তার শাড়ীর সুমুখে ঝুলছিল কোঁচা।

—হো'ক না হিন্দুস্থানী। হিন্দুস্থানী ও ত হিন্দু। আর তোদের চাইতে ঢের পাকা হিন্দু। তাদের মেয়েদের পেটে থাক্‌তেই পাত্র ঠিক ও পত্র হয়ে যায়। জানিস দুধের দাঁত পড়্‌বার আগে মেয়ের

বিয়ে না হলে তাদের জাত যায়? কোন হিন্দুস্থানী হিঁদুর বাড়ীতে অত বড় মেয়ে আইবুড় দেখেছিস—বল্‌ত গাধা!

—হুজুর, মেয়েটা হিঁদু নয়, মুসলমান।

—কি বললি—মুসলমান? হিন্দুর মন্দিরে যেখানে শূদ্রের প্রবেশ নিষেধ, সেইখানে রাসকেল মুসলমান ঢুকিয়েছিস! মন্দির অপবিত্র হবে, ব্রাহ্মণের ছেলের জাত যাবে, কি সর্ব্বনাশের কথা! লক্ষ্মীছাড়িকে এখনি মন্দির থেকে বার করে দে!

—হুজুর, এই দুর্য্যোগের মধ্যে—

—দুর্য্যোগ ফুর্য্যোগ জানি নে, এই মুহূর্ত্তে ঐ মুসলমানীকে দে অর্দ্ধচন্দ্র।

—হুজুর, বাইরে ত দেবতা অপ্রসন্ন আর ভিতরেও যদি দেবতা আশ্রয় না দেন্ ত বেচারা যায় কোথায়? হো'ক না মুসলমান, মানুষ ত বটে,—আমাদের মত ওরও রক্ত-মাংসের শরীর।

—খোপ্‌সুরতি দেখে বেটার ধর্ম্মজ্ঞান লোপ পেয়েছে! আমার হুকুম মানবি কি না বল্? হয় ওকে মন্দির থেকে বার কর্ নয় তোকে ঘর থেকে বার করে দিচ্ছি,—এই জমাদার! ইস-কো গরদান পাকড়কে নিকাল দেও!

—হুজুর, একটু সবুর করুন। হুজুরের হুকুম তামিল না করতে হলে আমাকে কি আর এতটা বেগ পেতে হ'ত? ওকে কি আমাকে কাউকে গরদানি দিতে হবে না। মেয়েটি হিন্দুস্থানীও নয়, মুসলমানীও নয়, বাঙ্গালী কুলীন ব্রাহ্মণের মেয়ে।

—আবার মিথ্যে কথা? কুলীনের মেয়ে গায়ে ওড়না ওড়ে আর কোঁচা দিয়ে শাড়ী পরে।

—হুজুর, ও আমার দেখবার ভুল। শাড়ীটে ভিজে সুমুখের দিকে জড় হয়ে গিয়েছিল তাই দেখাচ্ছিল যেন কোঁচা—আর গায়ে ছিল চেলির চাদর তাই ওড়না বলে ভুল করেছিলুম।

—এই যে বল্‌লি সলমা চুমকির কাজ করা?

—হুজুর, ঐ চাদরের উপর গোটাকতক জোনাকি বসেছিল তাই চুমকির মত দেখাচ্ছিল।

—তাই বল্। আঃ! বাঁচা গেল। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল!

—হুজুর, আপনার না হোক আমার ত তাই। জমাদারের নাম শুনে ভয়ে ত আমার পাঁচ প্রাণ দশদিকে উড়ে গেছল। ভুল করে একটা কথা……

—অমন ভুল করিস কেন?

—হুজুর, অমন ভুল অনেক বড় বড় কবিরাও করেন, আমি ত কোন্ ছার—তবে তাঁদের বেলায় সে সব ছাপার ভুল বলে পার পেয়ে যায়।

—সে যাই হোক। ঘোষাল এতক্ষণে গল্পটা বেশ গুছিয়ে এনেছে। কুলীন ব্রাহ্মণের মেয়ে, এতদিন বিয়ে হয় নি, শেষটা ভগবানের অনুগ্রহে কেমন বর জুটে গেল। একেই ত বলে প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ। ঘোষাল, তোর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। তুই যে খালি ব্রাহ্মণের ছেলের জাত বাঁচিয়েছিস্ তাই নয়—ব্রাহ্মণের মেয়ের বাপেরও জাত বাঁচিয়েছিস্। এখন নিশ্চিন্ত মনে গল্প বলে যা। কি খেয়ে গল্প বলিস্ বল্ ত? এবার তোকে বিলেতি খাওয়াব।

—হুজুরের, প্রসাদ চরণামৃত জ্ঞানে পান কর্‌ব, তারপরে মুখ দিয়ে বেরবে অনর্গল বিলেতি গল্প। এখন যা হল শুনুন।

ভালবাসা জিনিসটে অন্ততঃ কাব্যে একটা সংক্রামক ব্যাধি। কবিরা এক-জনের মনের সিগরেট থেকে আর একজনের মনের সিগরেট ধরিয়ে নেন। কাব্যের এ হচ্ছে মামুলি দস্তুর। তাই আমাকে বল্‌তেই হবে যে ব্রাহ্মণের ছেলের ভালবাসার ছোঁয়াচ লেগে সেই কুলীন-কুমারীর মনে, শ্যাম্পেনের নেশার মত আস্তে আস্তে ভালবাসার রং ধর্‌তে সুরু কর্‌লে।

—কি বল্‌লি—স্যাম্পেনের নেশার মত আস্তে আস্তে? গাছে না উঠতেই এক কাঁধি—বিলেতির নাম শুনেই অজ্ঞান হয়েছিস্ আর বেফাঁস বকছিস। বেটা খাঁটির খদ্দের, শ্যাম্পেনের গুণাগুণ তুই কি জানিস? পোর্ট বল্ ক্লারেট বল্ জিন বল্ রম্ বল্ হুইস্কি বল্ ব্রাণ্ডি বল্.—আমার ত আর কিছু জান্‌তে বাকী নেই। শ্যাম্পেনের নেশা হয় ধরেনা, নয় চট্ করে মাথায় চড়ে যায়। ভালবাসার নেশা যদি আস্তে আস্তে চড়াতে চাস্ ত সেরীর সঙ্গে তুলনা দে,—গেলাসের পর গেলাসে যা রেক্তার গাঁথুনি গেঁথে যায়।

—হুজুর ঠিক বলেছেন, মেয়েমানুষের মনে ভালবাসা আস্তে আস্তে বাড়ে বটে, কিন্তু তার বনেদ্ খুব পাকা হয়। ওদের মনে ও বস্তু একবার শিকড় গাড়লে তা আর উপড়ে ফেলা যায় না—কেননা সে শিকড় শুধু ভিতরের দিকেই ডুব মারে। কিন্তু হুজুর এইখানে একটু মুস্কিলে পড়েছি। স্ত্রীলোকের ভালবাসা বর্ণনা করা যায় না, কেননা তার কোনও বাইরের লক্ষণ দেখা যায় না; আর যদি দেখা যায়, তাহলেই বুঝতে হবে সে সব হাবভাব, ভিতরে সব ফাঁকা।

—তবে কি ওদের মনের কথা জানবার যো নেই?

—আমি ত তা বলিনি,—আমি বলছি জানা দুঃসাধ্য কিন্তু অসাধ্য, নয়। ওদের মুখ ওদের বুকের আয়না নয়। যেমন পুরুষের পাণ্ডুরোগ,

তেমনি স্ত্রীলোকের হৃদ্‌রোগ ধরা পড়ে চোখে, এখানেও মেয়েটা ঐ চোখেই ধরা দিলে। কি হল শুনুন।

তার চোখের ভিতর একটা অতি ঢিমে অতি ঠাণ্ডা আলো ফুটে ওঠল। কিন্তু সে আলো বিদ্যুতের। সে বিদ্যুৎ স্ত্রী-বিদ্যুৎ বলে অত ঠাণ্ডা। সেই স্ত্রী-বিদ্যুতের টানে ব্রাহ্মণের ছেলের চোখ থেকে পুং-বিদ্যুৎ ছুটে বেরিয়ে এল—তার-পর সেই দুই বিদ্যুৎ মিলে লুকোচুরি খেলতে লাগল।

"নয়ন ঢুলাঢুলি লহু লহু হাস
অঙ্গ হেলাহেলি গদগদ ভাষ।"

—উজ্জ্বল নীলমণি আবার কি বলে হে?

—আজ্ঞে ওঁর ভাবোল্লাস হয়েছে তাই উনি আখর দিচ্ছেন।

—আখরই দিন আর যাই দিন্ আমি বলে রাখছি যে আখেরে ঐ "নয়ন ঢুলাঢুলি লহু লহু হাসের" বেশী আর আমি যেতে দেব না।

—আজ্ঞে এর একটা ত আর একটার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম।

—রাখো হে তোমার পরিণামবাদ, অমন ঢের ঢের দর্শন দেখেছি।

—হুজুর, গোঁসাইজির কথা শুধু দর্শন নয়, বিজ্ঞানসম্মতও বটে। কোন বস্তুর ভিতর বিদ্যুৎ সেঁদুলে তা আপনি হয়ে ওঠে চুম্বক।

—বটে! হতভাগারা মরবার আর জায়গা পেলে না। দেবমন্দিরকে করে তুললে একটা কুঞ্জবন। যেমন আক্কেল ঘোষালের, তেমনি উজ্জ্বল নীলমণির—এখন দেখছি এ দুটো মাসতুতো ভাই।

—হুজুর, বড় বড় কবিরাও এ কাজ পূর্ব্বে করে গিয়েছেন।

—সত্যি নাকি পণ্ডিত মশায়?

—আজ্ঞে আমি ত কোন সংস্কৃত কাব্যে দেখি নি যে দেবালয় হয়েছে প্রেমের রঙ্গালয়।

—আমাদের পদাবলীতেও ও সব ব্যাপার মন্দিরের বাইরেই ঘটে। বিদ্যাপতি ঠাকুর বলেছেন—"ঘব গোধুলী সময় ভেলি ধনী মন্দির বাহির ভেলি।"

—ঘোষাল নিজে কর্‌বি কুকীর্ত্তি আর বড় বড় কবিদের ঘাড়ে চাপাবি দোষ।

—হুজুর, আমি মিথ্যে কথা বলি নি—বাংলার বড় বড় লেখকেরা এ কাজ না কর্‌লে আমার কি সাহস যে আমি আগে ভাগেই তা করে বস্‌ব,—আমি ত একজন ছোট গল্পকার। মহাজনো যেন গতা স পন্থা হিসেবেই আমি চলি।

—বাংলা আবার ভাষা, তার আবার লেখক, তার আবার নজির। মন্দিরের ভিতর আমি মধুর রসের চর্চ্চা আর বেশী কর্‌তে দেব না, কে জানে তোদের হাতে পড়ে সে রস কতদূর গড়াবে।

—তাহলে বলি হুজুর, ওটা আসলে মন্দির নয়, ভোগের দালান।

—আবার মিথ্যে কথা? এই হাজার বার বলেছিস্ মন্দির আর এখন বলছিস ভোগের দালান।

—হুজুর, মন্দির হলে আর তার ভিতর ঠাকুর থাক্‌ত না? আগেই ত বলেছি যে সেখানে একটি ছাড়া দুটি মূর্ত্তি ছিল না।

—তাও ত বটে! খুব ডিগ্‌বাজি খেতে শিখেছিস্। তুই আর জন্মে ছিলি গেরবাজ।

—হুজুরের কৃপায় এখন লোটন না হলেই বাঁচি!

—আচ্ছা যাক্, এখন তুই গল্প বলে যা, গল্পটা এতক্ষণে জম্‌ছে।

—হুজুর তার পর—

ব্রাহ্মণ সন্তানটি এমনি স্নেহভরে ব্রাহ্মণ কন্যাটির দিকে দৃষ্টিপাত কর্‌তে লাগল যে তার গায়ে সাত্ত্বিকভাবের লক্ষণগুলি সব ফুটে উঠল। তার কপাল বেয়ে ঘামের সঙ্গে সিঁথের সিঁদুর গলে তার ঠোঁটের উপর পড়্‌ল আর তার অধর পান-খাওয়া ঠোঁটের মত লাল টুকটুকে হয়ে উঠল।

—রোস্ রোস্ সিঁদুরের কথা কি বললি?

—কই হুজুর, সিঁদুরের নামও ত ঠোঁটে আনি নি!

—উঃ তুই কি ঘোর মিথ্যাবাদী! সিঁদুর শুধু নিজের ঠোঁটে আনিস নি, ওর ঠোঁটেও মাখিয়েছিস—

—তাহলে হুজুর, ও মুখ ফস্কে হয়ে গেছে।

—ও সব জুয়োচ্চুরি কথা আর শুনছি নে। একটা সধবাকে রাসকেল আমাকে ঠকিয়ে কুমারী বলে চালিয়ে দিচ্ছিল।

—আজ্ঞে সধবাই যদি হয় তাতেই বা ক্ষতি কি?

—কি বল্‌লে উজ্জ্বল নীলমণি, ক্ষতি কি?

—আজ্ঞে আমি বলছিলুম কি, নায়িকা ত পরকীয়াও হয়—

এ কথা শুনে সভাসুদ্ধ লোক একবাক্যে ছি ছি করে উঠল। উজ্জ্বল নীলমণি তাতে ক্ষান্ত না হয়ে বললেন—

—হয় কি না হয় তা বিবর্ত্তবিলাস, মীরাবাইয়ের করচা প্রভৃতি পড়ে দেখুন, এমন কি কবিরাজ গোস্বামী পর্য্যন্ত.....

এই কথায় একটা মহা হৈ চৈ পড়ে গেল, সকলে এক সঙ্গে কথা বল্‌তে সুরু কর্‌লে—কেউ কারও কথায় কান দিতে রাজি হল না। উজ্জ্বল নীলমণি তাঁর মিহি মেয়েলি গলা তারায় চড়িয়ে বক্তৃতা সুরু করলেন। "পিকোলোর" আওয়াজ যেমন ব্যাণ্ডের গোলমালকে

ছাড়িয়ে ওঠে—তাঁর আওয়াজও এই হৈ চৈ-এর উপরে উঠে গেল। সকলে শুনতে পেলে তিনি বলছেন—

—আগে আমার কথাটা শেষ করতে দিন—তারপর যত খুসি চেঁচামেচি করবেন। স্বকীয়া ত পদকর্ত্তাদের মতে "কর্ম্মীনারী"—সে না হলে সংসার চলে না; কিন্তু রস-সাহিত্যে তার স্থান কোথায়? দেখান ত পদাবলীতে.....

—রক্ষা করুন গোঁসাইজি থামুন, আপনার ও সব মত এখানে চলবে না, আপনার পাস-করা শিষ্যেরা হ'লে ওর যা হয় তা একটা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বার করতে পারত, কিন্তু দেখছেন না পণ্ডিত মশায় রাগ করে উঠে যাচ্ছেন। আপনার পাপের বোঝা আমার ঘাড়ে নিতে আমি মোটেই রাজি নই। দাঁড়ান পণ্ডিত মশায়। ব্যাপারটা কি তা না বুঝেই আপনারা সব চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। আসলে ঘটনা এই যে, মেয়েটি সধবা বটে কিন্তু পরকীয়া নয়।

—তুই দেখছি বেটা একেবারে বেপরোয়া হয়ে গিয়েছিস—যা মুখে আসছে তাই বলছিস। স্ত্রীলোকটা হ'ল সধবা অথচ কারও স্ত্রী নয়। এমন অসম্ভব কাণ্ড মগের মুলুকেও হয় না।

—হুজুর, আমি মিছে কথা বলি নি। মেয়েটির বিয়ে হয়েছিল বটে কিন্তু দশ বৎসর স্বামী নিরুদ্দেশ। আর সে যখন স্বামীর পথ চেয়ে বসে বসে শেষটা হতাশ হয়ে পথে বেরিয়ে পড়েছে—তখন তাকে বে-ওয়ারিশ হিসেবেই ধরতে হবে।

—"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে" এ বচন শাস্ত্রে থাকলেও কাব্যে নেই। একালে ও ওসব কথা মুখে আনতেও নেই, কেননা তা শুনে অর্ব্বাচীনদের মতিভ্রম হতে পারে। আজ যদি তোমরা ও সব কাব্যে

চালাও, দু'দিন পরে তা সমাজে চলবে, তারপর সব অধঃপাতে যাবে। দেখো ঘোষাল, তুমি আমার অতিশয় প্রিয়পাত্র, পুত্রতুল্য, কেননা তোমার নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি আছে; কিন্তু রঙ্গরসের ভূত যখন তোমার ঘাড়ে চাপে—তখন তুমি এত প্রলাপ বকো যে প্রবীণ লোকের পক্ষে সে ক্ষেত্রে তিষ্ঠোনো ভার। আজ যেরকম উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় দিচ্ছ, তাতে আমি তোমাকে ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছি।

এই বলে পণ্ডিত মশায় ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বিকচ্ছ হওয়ায় তাঁর গতিরোধ হ'ল। এই সুযোগে ঘোষাল তাঁর কাছে জোড়হস্তে নিবেদন করলে—

—আপনি আমার ধর্ম্ম-বাপ। আপনার পায়ে ধরি আমাকে বিনা অপরাধে ত্যাজ্যপুত্র করে চলে যাবেন না। এতটা উতলা হবার কোনই কারণ নেই। সিঁথেয় সিঁদুর থাকলে যে সধবা হতেই হবে এমন ত কোনও কথা নেই। ও মেয়েটি ছিল ভৈরবী, তাই না তার মাথায় ছিল রুলি।

এ কথা শুনে সভা আবার শান্ত হ'ল, স্মৃতিরত্ন তাঁর আসন গ্রহণ করলেন। রায় মহাশয় কিন্তু খাড়া হয়ে বসে বজ্র-গম্ভীর স্বরে বললেন—

—ঘোষাল, তোর গল্প বন্ধ কর্—নইলে কত যে মিথ্যে কথা বানিয়ে বলবি তার আর আদি অন্ত নেই—আজ তোর ঘাড়ে রসিকতার নয়, মিথ্যে কথার ভূত চেপেছে, ঝাঁটা দিয়ে না ঝাড়লে তা নামবে না।

—হুজুর, আমার একটি কথাও মিছে নয়। ভৈরবী না হলে কি

গেরস্তর ঝি বউ লাল শাড়ী পরে, লাল দোপাট্টা ওড়ে, কাছা কোঁচা দেয়, মাথার চুল চূড়ো করে বাঁধে, এক কপাল সিঁদুর লেপে—

—হোক না ভৈরবী, তাতেই তুই বাঁচিস কি করে? ভৈরবীর আবার প্রেম কিরে—

—হুজুর এতক্ষণই যদি ধৈর্য্য ধরে থাকলেন, তবে আর একটু থাকুন। গল্পের শেষটা শুনলে আপনি নিশ্চয়ই খুসি হবেন। শুনুন—

ঐ ভৈরবীটি আর কেউ নয়, ঐ ব্রাহ্মণের ছেলেরই স্ত্রী। ভদ্রলোক দশ বৎসর নিরুদ্দেশ হয়েছিল। দেশের লোক বল্‌লে তার মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু পতিপ্রাণা রমণী সে কথায় বিশ্বেস কর্‌লে না। "আমার সিঁথের সিঁদুরের যদি জোর থাকে, তবে আমার হাতের লোহা নিশ্চয়ই ক্ষয় যাবে। আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি আমার স্বামী হয়েছেন স্বামীজি।" এই বলে সে স্বামীর সন্ধানে ভৈরবী সেজে বেরিয়ে পড়্‌ল। ভগবানের ইচ্ছায় এই পুণ্যস্থানে দুজনের আবার মিলন হ'ল। স্ত্রী স্বামীকে দেখামাত্রই চিন্‌তে পেরেছিল, কারণ এই দশ বৎসর শয়নে স্বপনে সে ঐ মূর্ত্তিই ধ্যান করেছিল। কিন্তু স্বামী তাকে চিন্‌তে পারে নি দেখে সে স্বামীকে একটু খেলিয়ে সন্ন্যাসের ঘোলাজল থেকে গার্হস্থ্যের শুকনো ডাঙ্গায় তোলবার মতলবে এতক্ষণ জড়সড় হয়ে ও মুড়িসুড়ি দিয়ে ছিল। তারপরে যখন সে চাদরখানি মাথা থেকে ফেলে দিয়ে সটান এসে স্বামীর সুমুখে দাঁড়াল, তখন ব্রাহ্মণ সন্তান বুঝতে পার্‌লে "এই সেই"; অমনি সেই বৈদান্তিক-শাক্ত "তত্ত্বমসি" বলে ছুটে তাকে আলিঙ্গন কর্‌তে গিয়ে হাতের মধ্যে কিছুই পেলে না, শুধু দেয়ালে তার মাথা ঠুঁকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা দমকা হাওয়ায় মন্দিরের দুয়োর খুলে গেল আর তার ভিতরে ভোরের আলোয় দেখাগেল মন্দির একেবারে শূন্য

—এ আবার কি অদ্ভুত কাণ্ড ঘটালি।

—হুজুর ভূতের গল্প শুনতে চেয়েছিলেন তাই শোনালুম।

বলা বাহুল্য ঘোষালের হাতে গল্পের এইরূপ অপমৃত্যু ঘটায়, সব

চেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন উজ্জ্বল নীলমণি। তিনি দাঁত-খিঁচিয়ে বল্‌লেন—

—ভূতের গল্প না তোমার মাথা! পেত্নীর গল্প!

এই সময় বাড়ীর ভিতর থেকে খবর এলো যে মা-ঠাকুরাণীর মাথা ধরেছে। রায় মহাশয় অমনি হুড়মুড় করে উঠে ব্যতিব্যস্ত হয়ে তাঁর পঁয়ষট্টী বৎসরের ভোগায়তন দেহের বোঝা কায়ক্লেশে অন্দর মহল নিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে সভাও ভঙ্গ হ'ল।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।